সম্পাদকের কলমে

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর

বাংলা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংখ্যার

সম্পাদকের কলমে

বিজনকুমার লোধ সম্পাদিত

প্রথম খণ্ড

প্রথম সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ | সাধারণতন্ত্র দিবস ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
ইং ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৩

প্রকাশক



দীপ্তি প্রকাশনী
৩৭ নং টালীগঞ্জ রোড,
কালীঘাট, কলিকাতা-২৬।

মুদ্রক | বোস এণ্ড ভট্টাচার্য্য প্রিন্টার্স
৪৪, চেতলা রোড,
কলিকাতা-২৭।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ | ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রিন্টিং প্রেস
৬, জয়নুদ্দিন মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-২৭।

বাঁধাই | কোয়ালিটি বাইণ্ডার্স
১৭/২, চেতলা রোড,
কলিকাতা-২৭।

কলিকাতায় গ্রন্থ প্রাপ্তির ঠিকানা

১। পূর্বাচল
৮২, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

২। শ্রীশ্রীতারা পুস্তকালয়
১৪৪এইচ, এস, পি,
মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬

উৎসর্গ

বাবা ৺ভুবনেশ্বর লোধের
অমর স্মৃতির প্রতি

তুমি আমায় নাবালক রেখেই তোমার
ভুবন তুমি ত্যাগ করলে, আজ বয়সের
মাপকাঠিতে সাবালক হ'লেও তোমার কাছে
নাবালক ছিলাম, আছি এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত
নাবালক—এই নামেই থাকব।

SAMPADAKER KALAMEY

Edited and Collected by

BIJAN KUMAR LODH

পত্রিকা সম্পাদকদের নাম

আনন্দ বাজার পত্রিকা	১৯৪৭-১৯৫৮	শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	১৯৫৯ —	শ্রীঅশোক কুমার সরকার
কালান্তর	১৯৬৭ —	শ্রীভবানী সেন (২য় খণ্ডে)
	১৯৬৮ —	শ্রীজ্যোতি দাসগুপ্ত („ „)
গণশক্তি	১৯৬৭ —	শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায় (২য় খণ্ডে)
দৈনিক জনসেবক	১৯৫৭ —	শ্রীঅতুল্য ঘোষ
	১৯৬০ —	শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	১৯৬৭ —	শ্রীসুহৃদ রুদ্র
দৈনিক বসুমতী	১৯৫৩-১৯৫৭	শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ
	১৯৫৮	শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য
	১৯৫৯-১৯৬২	শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী
	১৯৬৩-১৯৭০	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
	১৯৭২	শ্রীসুকুমার গুহ মজুমদার
যুগান্তর	১৯৪৭-১৯৬২	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
	১৯৬৩ —	শ্রীসুকমলকান্তি ঘোষ
লোকসেবক	১৯৬০ —	শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য
স্বাধীনতা	১৯৫৬-১৯৬২	শ্রীসরোজ মুখোপাধ্যায়
	১৯৬৩ —	শ্রীতরুণ সেনগুপ্ত
সত্যযুগ	১৯৭২ —	শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় (২য় খণ্ডে)

—আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি

● আনন্দ বাজার পত্রিকা ● কালান্তর ● গণশক্তি ● দৈনিক জনসেবক ● দৈনিক বসুমতী ● যুগান্তর ● লোকসেবক ● স্বাধীনতা ● সত্যযুগ

পরামর্শ ও সহযোগিতা যাঁরা করেছেন

স্বামী নিরাময়ানন্দ, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতি জীবন প্রভা সরকার (লোধ), অধ্যাপক নিখিল কুমার নন্দী, অধ্যাপক ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীবিশ্বনাথ বোস, শ্রীস্বপন সেন, শ্রীসুধীররঞ্জন বৈদ্য, শ্রীমনোজ কুমার রায়চৌধুরী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র দাস, শ্রীপ্রণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসমীর রায়চৌধুরী, শ্রীমলয়শংকর দাসগুপ্ত, শ্রীকঞ্জনাভ মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅরুণ কুমার সরকার, শ্রীসুধাংসু রঞ্জন দাস, শ্রীসমর সরকার (লোধ), শ্রীরণজিৎ কুমার বোস, শ্রীঅনিল চক্রবর্ত্তী, শ্রীঅসিত বরণ রায়, শ্রীউদয় শঙ্কর ঘোষ, শ্রীমিহির ঘোষ।

দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু পাঠকদের কাছে আরও আলোড়ন জাগাবে—এতে সংযোজিত হবে কালান্তর, গণশক্তি ও সত্যযুগ পত্রিকা।

পথ

শ্রীবিজন কুমার লোধ "স্বাধীনতার পঁচিশ বছর : সম্পাদকের কলমে" সংকলন করে প্রকাশকের সন্ধান করে করে হতাশ হয়ে একদিন আমার কাছে এলেন। তাঁর এতদিনের পরিশ্রম একমাত্র প্রকাশকের প্রত্যাখ্যানেই কি ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

বিজন কুমারের প্রকাশন জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু উৎসাহ অদম্য। প্রকাশনের মধ্য দিয়ে তাঁর পরিশ্রম যদি সার্থকতা লাভ না করে তাহলে আজকের এই উৎসাহ অচিরেই থিতিয়ে যাবে, সমাজের কোন কাজে আসবে না। তাঁর হতাশার কাহিনী শুনে বললাম, একটিমাত্র উপায় আছে।

বিজন সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন, কি ?

আমি বললাম, এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে আপনার উপরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক বাংলা বই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে অগ্রিম মূল্য সংগ্রহ করে। যাঁরা বই প্রকাশের আগেই দাম দিতেন অথবা দান করতেন দামের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী পরিমাণ তাঁদের নাম ছাপা হতো বইয়ে। বই ছাপাবার এই পন্থাটি এসেছিল ইংলণ্ড থেকে। এই উপায়ে সেখানে বহু মুল্যবান বই প্রকাশিত হয়েছিল। তবে এই পদ্ধতির সাফল্য নির্ভর করে লেখকের উদ্যোগ ও কর্মতৎপরতার উপর।

বিজন এই পথ গ্রহণ করে তাঁর সংকলিত গ্রন্থ প্রকাশ করতে সক্ষম হলেন। এটা তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আরও অনেকে হয়তো মুল্যবান প্রবন্ধের বই প্রকাশ করতে পারবেন।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

এই বইটি কিঞ্চিৎ অভিনব সন্দেহ নেই। কেননা, ভারতীয় স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকার গত পঁচিশ বছরের সম্পাদকীয় মতামত এই বইতে সংকলিত হয়েছে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ছাড়াও এতে আছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সমূহ এবং অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির মূল্যায়ন। অতএব এই বইটির একটি স্বাতন্ত্র্য আছে। সংবাদপত্রকে জনমতের বাহন বলে মনে করা হয় এবং সংবাদপত্রই সমাজ-মানুষের দর্পণ, এমন বিশ্বাস সর্বত্র প্রচলিত। সুতরাং সেই দর্পণে আমাদের স্বাধীনতার গত ২৫ বছরের রায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, যে কথা জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। এই বইয়ের সংকলয়িতা শ্রীমান বিজন কুমার লোধ বয়সে খুবই নবীন। কিন্তু তিনি নিজে তথাকথিত সাংবাদিক বা সাহিত্যিক না হওয়া সত্ত্বেও এবং সংকলনের ব্যাপারে যে কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তার তারিফ না করে পারা যায় না। কেননা, প্রবন্ধ উপন্যাসের ও রম্য রচনার চটকদার বাজারে এই এই ধরণের বই সম্পাদনা করা ও প্রকাশ করা কিছুটা সাহসের পরিচায়ক বৈকি!

ভারতীয় স্বাধীনতার ২৫ বছর নিশ্চয়ই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ইতিহাসের বিচারে একটি নূতন পরিচ্ছেদের আরম্ভ। কেননা, যে পঁচিশ বছর আমরা পিছনে ফেলে এলাম, বলা যেতে পারে সেইটি ভারতীয় জনগণের আসল স্বাধীনতার কিংবা জাতীয় মুক্তির ভূমিকা মাত্র। অর্থাৎ স্বাধীনতার যে আসল লক্ষ্য দেশের আপামর জনগণের অন্ন, বস্ত্র, জীবিকা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং গৃহের

সমস্যার মীমাংসা, সেই প্রশ্নগুলির কোনই মীমাংসা হয়নি। প্ল্যানিং কমিশনের পক্ষ থেকেই সম্প্রতি (২৫শে সেপ্টেম্বর '৭২) প্রকাশ করা হয়েছে যে, দেশের ২২ কোটি কিংবা শতকরা ৪০ জনেরও বেশী "দারিদ্র্য সীমানার" নীচে বাস করে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান অর্থ-মন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ এই সংজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ১৯৬০-৬১ সালের দ্রব্যমূল্যের বিচারে যাদের মাসিক উপার্জন ২০ টাকারও কম কিম্বা বর্তমান বাজার দরের বিচারে ৩৭ টাকার কম তারাই "দারিদ্র্য সীমানার" নীচে বাস করে। অর্থাৎ স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বছরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ যখন নিতান্তই দরিদ্র, এমনকি মাসে যখন তাদের ৩৭ টাকা উপার্জনেরও ব্যবস্থা নেই তখন কিন্তু ভারতের ধনপতি ও ক্রোড়পতিগণ 'রামরাজত্বে' পৌঁছে গেছে! প্রকৃতপক্ষে ভারতের গোটা অর্থনীতির উপর যে ৭৫টা পরিবার একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁরা কিন্তু বছরের পর বছর কুবেরের ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করে চলেছেন। গত ২২শে আগস্ট কেন্দ্রীয় কোম্পানী বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীরঘুনাথ রেড্ডী যে সরকারী বিবৃতি প্রকাশ করেছেন, তা'তে দেখা যায় যে ১৯৬৬-৬৭ থেকে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে অর্থাৎ গত তিন বছরে ভারতের বৃহত্তম দশটি একচেটিয়া পরি-বারের সম্পদ বিপুলভাবে স্ফীতিলাভ করেছে। এই দশটি মনো-পলি কারবারের প্রথম তিনটির কথা উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে, ১৯৬৬-৬৭ সালে যেখানে তাদের সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫০৬·৩৬ কোটি, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে তাদের হয়েছে ৬৩৮·৫০ কোটি টাকা। বিড়লাদের বেড়েছে ৪৫৭·৮৪ কোটি টাকা থেকে ৬২৯·৬০ কোটি টাকা, আর মার্টিন বার্নের বেড়েছে ১৫৩·০৬ কোটি টাকা থেকে ১৭৬·০০ টাকা। মাত্র তিন বছরে এই পরিমাণ সম্পদ বেড়েছে এবং এই বৃদ্ধির হার টাটাদের শতকরা ২৬·৩৪, বিড়লাদের শতকরা ৩৭·৫৪ ভাগ। অন্যান্য একচেটিয়া পতিদের উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।

একটি গোটা দেশের অর্থনৈতিক চিত্র বুঝিবার পক্ষে যদিও এই তালিকা যথেষ্ট নয়, তবু এটা একেবারেই স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষের

যখন শতকরা ৭০ জন মানুষ নিতান্তই দরিদ্র, তখন ধনিক শ্রেণীর সম্পদ ক্রমবর্দ্ধমান ! এমন কি, বর্তমান ১৯৭২ সালের রজত জয়ন্তী বছরে পশ্চিমবঙ্গে, উড়িষ্যায়, বিহারে, রাজস্থানে ও মাদ্রাজের জনগণের দুর্গতি ভয়াবহ আকারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অসংখ্য মানুষ অর্দ্ধভুক্ত, অভুক্ত এবং অনাহারে বহু নর-নারীর মৃত্যু ঘটেছে। এমন কি বহু মাতা সন্তানসহ আত্মহত্যা করেছে অভাবের যন্ত্রণায়। বহু পিতাও আত্মনাশ করেছে উপার্জনের জ্বালা থেকে রেহাই পাবার জন্য। অথচ জাতির জনকরূপে বর্ণিত মহাত্মা গান্ধী ভারতে স্বরাজ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন 'তুচ্ছতম' দরিদ্র মানুষটির অভাব মুক্তির জন্য এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সৌধের রূপকার রূপে বিঘোষিত জওহরলাল নেহরু সহস্র কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য। কেননা, সমাজতন্ত্র ছাড়া ভারতের কোটি কোটি গরীব মানুষের কোন মুক্তি নেই—সমাজতন্ত্রের ভিৎ ছাড়া নতুন প্রাণবন্ত সমাজও গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু গত ২৫ বছরে গান্ধিজীর স্বরাজ বা রামরাজ্য এবং নেহরুজীর সমাজতন্ত্র কোথায় গেল ? সেদিক থেকে বিচার করলে বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় স্বাধীনতা এখনও ভারতীয় জন জীবনের পক্ষে আশীর্ব্বাদ-রূপে দেখা দেয় নি।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারত সাম্রাজ্য হারাতে আদৌ রাজী ছিল না। ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অধিনায়ক উইনস্টোন চার্চ্চিল তো ভারতের স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণরূপে খড়গহস্ত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ চালাবার শক্তি ব্রিটেন হারিয়ে ফেললো। আর দীর্ঘকালের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত আক্রমণের বৈপ্লবিক প্রেরণা। ১৯৪৬ সালের ভারতবর্ষ বিপ্লবের প্রান্তসীমায় এসে পড়েছে কিন্তু সেই বিপ্লবের পিছনে ছিল জনগণ এবং জনগণের মনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রেরণা জুগিয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে

জয়লাভের ঐতিহাসিক গৌরব। অন্যদিকে লাল ফৌজের এই জয়লাভের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ একেবারে নার্ভাস হয়ে পড়লো। এই অবস্থায় ১৯৪৬-৪৭ সালে ব্রিটিশ নেতারা উপলব্ধি করলেন যে, 'সর্ব্বনাশ এখন সমুৎপন্ন, তখন অর্দ্ধেক ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়'। অর্থাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নেতারা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী জাতীয় কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের হাতে ভারত শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করেই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন। কারণ, এর দ্বারা ভারতবর্ষে, পাকিস্তানে তথা গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় কমিউনিজম বা গণ-বিপ্লব প্রসারে কিম্বা সোভিয়েত প্রভাব বিস্তারে অলঙ্ঘনীয় বাধার সৃষ্টি হবে। ফলে, বৃটিশ সাম্রাজ্যগণ কোনও না কোন আকারে রক্ষা পেয়ে যাবে। মুস্লিম লীগ ও কংগ্রেস বরাবরই সমাজ-তন্ত্র ও সাম্যবাদের বিরোধী ছিল। অতএব এই দুই সংগঠনের নেতারা বৃটিশের হাত থেকে 'স্বাধীনতা' পাওয়ার জন্য সোৎসাহে এগিয়ে গেলেন—যদিও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও মতভেদ ছিল ভয়াবহ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ খুব চতুরের মত এই বিভেদের সুযোগ নিল। এখন সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে, চার্চ্চিল, মাউণ্টব্যাটেন ও জিন্না ভারতবর্ষ খণ্ডন বা পার্টিশান করার এক গোপন চক্রান্তে পূর্ব্বাহ্নেই একমত ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভারতব্যাপী দাঙ্গা-গুলি এই চক্রান্তেরই পরিণতি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জাতীয় নেতারা এই চক্রান্তে বাধা দিতে পারলেন না, যে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই অবস্থা অতিক্রম করার মত স্নায়ু ও শিরার অসম্ভব শক্তি বা সাহসও দেখাতে পারলেন না। লর্ড লুই মাউন্ট-ব্যাটেনের মোহের দ্বারা জওহরলাল নেহরু আচ্ছন্ন হলেন এবং গান্ধীজীও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পার্টিশান প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে, খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত এক করুণ এবং অশ্রুসিক্ত ট্রাজিডিতে পরিণত হলো।

ভারতের সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই ট্রাজিডির কিম্বা বিয়োগান্ত

নাটকের দৃশ্যগুলি আছে। আমরা অর্থাৎ জাতীয়বাদী সংবাদপত্রের সাংবাদিকেরা যে এই ট্রাজিডি রোধ করার জন্য খুব একটা গৌরব-জনক ভূমিকা পালন করতে পেরেছি, তা' মনে হয় না। কেননা, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলিও মূলতঃ কংগ্রেসের বা জাতীয় নেতাদের অনুগামী ছিল এবং ভারতীয় দরিদ্র জনগণের মুক্তির কিম্বা ভারতীয় গণ-বিপ্লবের দিক থেকে ভারতীয় স্বাধীনতার দাবীকে বিচার করে দেখা হয়নি। ফলে, মুস্লিম জনগণকেও আমরা আকৃষ্ট করতে পারিনি এবং এই প্রশ্নটিকে মূলতঃ কেবল সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক অর্থেই বিচার করেছি। যে আদর্শ ও নীতি এবং যে কর্মপদ্ধতি ও কর্ম্মসূচী জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতের গণ-মানুষকে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের ভিতর ডেকে আনতে পারতো, সেই জাতীয় ও উদার দৃঢ় দৃষ্টি থেকে ভারতের সংবাদপত্রগুলি অনেক দূরে ছিল—যেমন দূরে ছিল কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ। গত ২৫ বছরের দৈনিক সংবাদ-পত্রগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সম্ভবতঃ এই সাক্ষ্যই দেবে। বলা-বাহুল্য যে, যে সমস্ত সম্পাদক এই দিক দিয়ে সচেতন ছিলেন এবং জনগণের মুক্তির জন্য যথাসাধ্য লেখনী ধারণ করেছিলেন, সংবাদ-পত্রের মালিকেরা ও প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রভুরা তাঁদের দখলের জন্য চেস্টার কোন ত্রুটি করেন নি। অতএব সংবাদপত্রের আলোকে ভারতীয় স্বাধীনতার যে দাবি পাওয়া যাবে সেই দাবি খুব উজ্জ্বল বলে আমার মনে হয় না। কেননা, সাংবাদিকেরাও এই 'বুর্জোয়া' শাসনের ধ্যানধারণার স্বার্থেই পরিপুস্ট। তবু সমসাময়িক ইতি-হাসের নিশ্চয়ই একটা অনুসন্ধান মূল্য আছে এবং সেই মূল্যের বিচারে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের নিকট এই সঙ্কলন গ্রন্থটি নিশ্চয়ই উপেক্ষিত হবে না। ইতি—

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
৯. ১০. ৭২

সংকলকের চোখে

কি করব, চোখকে তো ফাঁকি দিতে পারি না! আজ থেকে দুই বছর পূর্বে বর্তমান যুগের ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়ের প্রতি চোখ পড়লো। যদিও সংবাদপত্র পাঠের নিয়মিত যাত্রা শুরু হয় যখন আমি ১৫ বছরের নাবালক। একটি পরিকল্পনা করলাম, বিশিষ্ট বাংলা দৈনিক সংবাদ-পত্রের বিশেষ বিশেষ সম্পাদকীয় পড়ব ও প্রয়োজন মত লিখে রাখব। জানালাম বিশেষ বন্ধুদের। তারা বললো, 'তোমার সব ব্যাপারেই পরিকল্পনা, বড় বড় প্ল্যান—আমরা তো বুঝতেই পারছি না এ সব করে তুমি কি করবে।'

বেশ কয়দিন গেল। চিন্তার সাগরে পাগলের মত অবস্থা। কিছুই স্থির করতে পারছি না, কিন্তু ভাবলাম রামকৃষ্ণ জন্মতিথিতে যখন পরিকল্পনা করেছি সম্পাদকীয় আমাকে পড়তেই হবে। কিন্তু রোজ রোজ সম্পাদকীয় পড়বার সময় কোথায় বা সংবাদপত্র কিনবারই বা সামর্থ্য কোথায়! আমি যে বেকার!

ভাবলাম ১৯৪৭ সালের পর থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পা-দকীয় সব পড়ব এবং লিখব। হিসাব করে দেখলাম '৪৭ সাল থেকে এই পর্য্যন্ত যদি প্রত্যেক সম্পাদকীয় সংগ্রহ করি তাহলে কয়েক হাজার হবে। অসম্ভব!

না। যদি স্বাধীনতা সংখ্যার সম্পাদকীয় সংগ্রহ করি এবং তা একটি সংকলন গ্রন্থ তৈরী করি তাহলে সংবাদপত্র পাঠকরা বেশ আগ্রহ সহকারে সম্পাদকীয় পড়তে পারবেন; সামনেই তো আমাদের স্বাধীনতার পঁচিশ বছর!

স্থির হলো, এবং সাধারণ পরিকল্পনাও তৈরী হয়ে গেল। ইতিমধ্যে উদ্বোধন শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী নিরাময়ানন্দের সাথে আলোচনা করে সব জানালাম। তিনি বললেন 'তোমার এটা **Bold idea**, ভাল করে যাও,' পরবর্তী আলোচনায় মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত ও প্রসিদ্ধ লেখক এবং সাংবাদিক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বিজয়বাবু বললেন, "আমার ক্ষীণ দৃষ্টিতে তোমার কাজে আমি যতদূর পারি সাহায্য করবার চেষ্টা করবই—তুমি তো মহৎ কাজে হাত দিয়েছ—শ্রীঠাকুর তোমায় সাহায্য করবেনই!"

সংগ্রহ চলাকালীন শ্রীবিজয় বাবুর (দাদা) পত্র নিয়ে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, 'তুমি তো প্রথমেই ভুল করেছ. তোমার এই সংকলন গ্রন্থ ছাপাবে, কিন্তু যাদের পত্রিকার সম্পাদকীয় নিয়েছ তাঁদের অনুমতি পেয়েছ?' উত্তর—না তা তো করি নি! বললেন, 'আগে তুমি অনুমতি পত্র আনো। তারপর অন্য সব—। আর তোমার এই বই ছাপাবার উদ্দেশ্য কি?' বললাম আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত কয়েকজন যুবক "ওঠ জাগো" বাহিনী নামে একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে চাই এবং এই সংকলন গ্রন্থের যাবতীয় স্বত্ব ও অধিকার বাহিনীর অধিকারেই থাকবে। বললেন, "বেশ, ভাল, যাও আগে অনুমতি নাও!"

যুগান্তর কার্যালয়ে গিয়ে অনুমতি পত্র আনলাম প্রায় দুদিন দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে। তারপর দৈনিক বসুমতী কার্যালয়ে, সেখানেও দেরী হওয়ার সম্ভবনা ছিল। যুগন্তরের অনুমতি দেখে অনুমতি দিলেন। আনন্দ বাজারের অনুমতি পত্র সব চাইতে বিলম্বে পেলাম এবং তাতে পরবর্তী কাজের দেরী হয়ে গেল। কয়েকবার গিয়ে ফিরেও এসেছি। সম্পাদকদের সাথে সরাসরি আলোচনা হয়নি, পত্রের মাধ্যমেই অনুমতি দিলেন। ভেবেছিলাম তাঁদের সাথে আলোচনা করে সংকলন গ্রন্থের জন্য কিছু পরামর্শ পাবো।

সবগুলি অনুমতি পত্র শ্রীবিবেকানন্দ বাবুকে দেখালাম। তিনি পরবর্ত্তী কাজের জন্য শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু (যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক) মহাশয়ের কাছে পাঠালেন। শ্রীবসু মহাশয়ের প্রাথমিক পরিচয় বেশ হৃদয়গ্রাহী হলেও তাঁর পরবর্তী পরামর্শে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর কথা মত কাজ করেছি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্যের জন্য চিঠি দেব ঠিক করেছি এমন সময় পরম বিশ্বস্ত সুহৃদ শ্রীপ্রিয়ব্রত সরকারের পরিচয়ে কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারের (পাঠাগার) বহু বিতর্কিত পুরুষ এবং সম্মানী মানুষ, সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় হলো।

চিত্তবাবু, 'আপনার কাজটা তো ভাল কিন্তু আপনি এই বই ছাপাবেন কি করে? এই সব কাজ কি আমাদের দেশে চলে! বিলাতে এই সব কাজের কদর আছে।—আচ্ছা যা হোক আপনাকে কয়েকটি পরামর্শ দিতে পারি। আপনি সরকারের কাছে চিঠি লিখুন। তারপর দেখুন কি জবাব দেয়। বইয়ের ব্যাপারে ওঁরা তো সাহায্য দেয়। তবে, আপনার এই বইয়ের ব্যাপারে দেবে কিনা আমি জানি না। আচ্ছা, আপনি দিয়ে দেখুন তো আগে—! তারপর অন্য চিন্তা করা যাবে। চিঠির সাথে কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সুপারিশ দিয়ে দিলে ভালো হবে। আপনি আনন্দ বাজারের সন্তোষ ঘোষের কাছে যান। তারপর প্রিয় দাসমুন্সীর কাছে গিয়ে বলুন, ওঁরা হাত দিলে তো এক মাসের মধ্যেই হয়ে যেতে পারে—কিন্তু আপনি যেতে পারবেন তো,—এই সবগুলি করে চিঠি দিন।' তাঁর পরামর্শ মত বিভিন্ন লোকের সুপারিশ সহকারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার কাছে চিঠি দিলাম। তাঁরা বলে দিয়েছিলেন উত্তর দেবেন। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত উক্ত চিঠির উত্তর পেলাম না।

গ্রন্থের সাধারণ ধারণার জন্য বিভিন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত পরের পাতায় দেওয়া হলো—

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর ঃ
সম্পাদকের কলমে
সঙ্কলক ঃ বিজন কুমার লোধ

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংকলিত বিভিন্ন দলমত-সাপেক্ষ অথবা নিরপেক্ষ ও জনপ্রিয় বাংলা সংবাদ-পত্রগুলির সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও বিচার। প্রতি বছরের রাষ্ট্রপতির বেতার-ভাষণ ও প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের বিশেষ অংশ সংযোজিত। ফলত পঁচিশ বছরের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থ-নৈতিক গতি-প্রকৃতির সঙ্গততম পুনর্মূল্যায়ন এই গ্রন্থ অনুসন্ধিৎসু বাঙালি পাঠকের কাছে এক সময় সচেতন দুর্মূল্য দলিল।

গ্রন্থের আলোচনায় বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অভিমত ঃ

- এই গ্রন্থের পরিকল্পনাটি সমর্থনযোগ্য। —অন্নদাশঙ্কর রায়।
- শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের অভিমতের সঙ্গে আমি একমত। বেসরকারী আয়োজনে পরিচালিত এই প্রকল্প উৎসাহ ও আনুকুল্য পাওয়ার যোগ্য। —সন্তোষ কুমার ঘোষ, সংযুক্ত সম্পাদক, আনন্দ বাজার পত্রিকা।
- সাধু সংকল্প। সরকারের সাহায্য পাবেন আশা করি। আমি শ্রীলোধকে সাধুবাদ জানাই। সুকমলকান্তি ঘোষ, সম্পাদক, যুগান্তর।
- Recommended for co-operation of Government.

  Priya Ranjan Dashmunshi, M.P.
- এটা সংবাদপত্রের যুগ। সংবাদপত্রের মতামত সরকার ও জন-সাধারণকে প্রভাবান্বিত করে। সুতরাং বিগত পঁচিশ বছর যাবৎ আমাদের স্বাধীনতাকে সংবাদপত্র কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, সে সম্পর্কে একটি সংকলনের উপযোগিতা আছে। আলোচ্য গ্রন্থ সে প্রয়োজন মেটাবে।

  —চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

- স্নেহভাজন প্রাক্তন ছাত্র শ্রীমান বিজন কুমার লোধ অনেক সময় ও শ্রমের মূল্যে যে সাংবাদিক ঐতিহাসিক দলিল তৈরী করেছেন তা জিজ্ঞাসু পাঠক ও কৌতূহলীদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক ফলাফলের ইতিহাস হিসেবে বিশেষ মূল্যবান। —নিখিল কুমার নন্দী, বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ।
- নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসে যাঁদের আগ্রহ তাঁদের কাছে এই বই যথেষ্ট সমাদর পাবে আশা করি। —ললিত কুমার প্রামানিক, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, শ্যামাপ্রসাদ কলেজ।

সম্পাদকীয় সংগ্রহের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ কলিকাতা জাতীয় পাঠাগার থেকে হয়েছে।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থের ভূমিকা দিয়েছেন।

আনন্দ বাজার, যুগান্তর, দৈনিক বসুমতী ইত্যাদি পত্রিকার অনুমতি পত্র না পেলে আমাদের শ্রমের মূল্য হতো না এবং সংকলন গ্রন্থও প্রকাশিত হতে পারতো না। এবং 'ওঠো জাগো বাহিনী'র আত্মপ্রকাশে দেরী হতো। তাই তাঁরা যে আমাদের অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য প্রত্যেক পত্রিকার সম্পাদকের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। বিশেষ চেষ্টা করেও দৈনিক বসুমতী পত্রিকার কয়েকটি সম্পাদকীয় সংগ্রহ করতে পারিনি। সংবাদ নিয়ে জানলাম পুরাণো কোনো ফাইল বর্তমান মালিক রাখেন নি। তৎকালীন কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' পত্রিকারও কিছু সংগ্রহ পাই নি। পার্টি বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় পুরাণো ফাইলের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। দৈনিক জনসেবক, লোকসেবক পত্রিকার কয়েকটি সম্পাদকীয় সংগ্রহ করেছি। ধারাবাহিক ভাবে সংগ্রহ করার অনেক অসুবিধা ছিল এবং যথাস্থানে ধারাবাহিকতা মোটেই নেই। গণশক্তি পত্রিকার ১৯৬৯ সালের স্বাধীনতা দিবসের উপর সম্পাদকীয় ছিল না।

কিছু কিছু মুদ্রণ ত্রুটি আমাদের চোখেই ধরা পড়েছে। তাছাড়া আরো কিছু মুদ্রণ বা বানান ভুল পাঠকদের চোখে পড়বে। এগুলি সংশোধন করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল। সংশোধন না করার কারণ সম্পাদকীয় সংশোধন কিংবা পত্রিকা সম্পাদকদের বানান আমরা বর্তমান সংস্করণে পরিবর্তন করিনি। কোন কোন পৃষ্ঠায় একই শব্দের দুরকম বানান দেখা যাবে (যেমন 'ব্রিটিশ', 'বৃটিশ', 'পনরই', 'পনেরই' ইত্যাদি) যে সব ভুল খুবই মারাত্মক বলে মনে হবে সেগুলি পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই সংশোধিত হবে।

অগ্রিম গ্রাহক সংগ্রহের ব্যাপারে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন তাঁদের নামের তালিকা প্রকাশ করলাম। এইসব সহযোগিদের কাছে আমি এমন ভাবে কৃতজ্ঞ যা কোনদিন ভুলতে পারবো না।

এছাড়া আর যাঁদের কাছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ছাপাখানার (প্রেস) শ্রমিক এবং মালিকদের অকৃত্রিম সহযোগিতা এবং সাহায্যের ফলে আমাদের গ্রন্থ প্রকাশের পথটি সহজ এবং সরল হয়েছে। অন্যথায় আরও বিলম্ব হতো। তাঁদের এই সহযোগিতা আমার কাছে সম্পদের মত।

পাঠকদের কাছে গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেলে দীর্ঘ দিনের শ্রম সার্থক বলে মনে করব।



মাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা মা, পাঁচটি ভাল কাজ করলে তুমি আমায় কিছু বল না বা ভাল বলে স্বীকারও করো না অথচ একটি খারাপ কাজ করলেই যা তা বলো, খেতে দাও না, এটা কি!

মা জবাব দিলেন, তোমার ভাল কাজগুলি কি তা আমি বা আমার অন্য কেহ বুঝতে পারে না—তোমার ভাল কাজের বিচার যদি তুমিই কর তা হলে তো হয় না! অন্যের চোখে ভাল বলে স্বীকৃত হলে এবং প্রসংশিত হলে তবেই হয় ভাল কাজ। আর খারাপ কাজ করলে তোমাকে সংশোধন করে দেওয়াই আমাদের কর্তব্য—তাই তোমাকে বলি ভাল কাজ করো—জীবনের অগ্রগতিকে সম্প্রসারিত করতে হলে ভাল কাজ এবং ভাল দৃষ্টি অবশ্যই রাখতে হবে—তা না হলে প্রাপ্ত বয়সে অশেষ দুর্গতি ভোগ করবে।"

ভারতের স্বাধীনতার পর সরকারের বিরোধী দলের যে সব নেতাগণ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা রেখে সরকারের কাজকর্মের সমালোচনা করেছেন বা করেন তাতে তাঁরা বরাবরই সরকারের গঠনমূলক কাজের বিশেষ বিচার করেন নি। কিংবা তাঁদের বিচারে ভাল কাজ নয় এই কথাই আজ পঁচিশ বছর যাবৎ আলোচিত হয়ে আসছে। তাই সরকারের সাথে বিরোধী দলগুলির বিশেষ আলোচনা হয় না এবং সরকারও বিরোধী দলের প্রতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পরামর্শ নেবার বেলায় আগ্রহ তেমন দেখান না। অথচ সংসদীয় গণ-তন্ত্রে বিরোধীদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ—।

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট তারিখের গভীর রাত্রি থেকে আজ পঁচিশ বছর পূর্তির সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণভাবে শক্তিশালী বিরোধী শক্তিবিহীন। ফলে শাসক সম্প্রদায় সুযোগ মত নিজেদের ছঁকে বাঁধা কাজ করে চলেছেন—যদিও মাঝে মাঝে নির্বাচনের সময় গরম হাওয়া প্রবাহিত হয় তবু এই পঁচিশ বছরের ইতিহাসে দেখা গেল শাসকরা কোন না কোন প্রকারে ক্ষমতায় আছেনই। আর থাকাটা একেবারে অসঙ্গতও নয়—কারণ তাঁরা বার বারই বলেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় কংগ্রেসের দান এত বেশী যার মূল্য কম করেও আগামী ১০০ বৎসর চলবে। এতে মাঝে মাঝে ভাঙন ধরলেও কড়া মসলা দিয়ে ঝালাই করে নেওয়া হবে। এবং

তাই হয়েছে গত ১৯৬৯ সালে কংগ্রেসের ভাঙনের মাধ্যমে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের পরম ভক্ত, এটা তার ৺পিতৃদেবের কল্যাণেই হয়েছে এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই কংগ্রেসকে ঢেলে সাজানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এবং জনগণের প্রাথমিক সমর্থন নিয়ে বিশেষ সাফল্য লাভও করেছেন। তাঁকে ভারতের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রধান নেত্রী রূপে স্বীকার করবার যুক্তি আজকের এই সময়ে কেহ উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কারণ অনেকেরই মূলমন্ত্র হয়েছে—"ইন্দিরাজী পিতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছেন।" যেমন নেহরুর জীবিত অবস্থায় কাগজপত্রে প্রচার করা হতো "নেহরুজী তাঁর বাবা মতিলাল নেহরুকে হার মানিয়েছেন…"। এইরূপ ভাবে ইন্দিরাজীকে বর্তমান ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং নেত্রী বলে মেনে নিচ্ছি।

এবার আসবো পঁচিশ বছরের স্বাধীনতায় ভারতের কোটি কোটি জনসাধারণ কি কি মৌলিক বিষয়ের প্রতি প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত এবং আশা আকাঙ্খার তহবিল পূর্ণ। মানুষের আশা অনেক কিছুই থাকে—তা পূরণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু সমগ্র আশা আকাঙ্খার কিছু অংশ পূরণ করার পক্ষেও যদি কোনো মানুষ একেবারে অসমর্থ হয় তা হলে তাকে অপদার্থ বলা ছাড়া আর কি বলা যায়? যদি সে বলে, 'আমি বার বার চেষ্টা করেও সাধারণ আশা পূরণ করতে পারছি না।'

কেন পারছেন না?

উত্তর, "আমি গরীব, আমার সামর্থ নেই; বৃটিশ শাসকের আমলে একেবারে অসহায় অবস্থা; তারপর বিশ্বযুদ্ধে আরও অসহায় অবস্থা—১৯৪৭ দেশ স্বাধীন হয়। অনেক আশা স্বাধীন দেশের সরকার তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবেন—। কিন্তু বার বারই দেখেছি কোন না কোন কারণে আমি ব্যর্থ হচ্ছি। কিন্তু দেখুন চেষ্টা চালিয়েই যাচ্ছি—হচ্ছে না, অর্থ নেই, পেটে ভাত নেই, পরিধানের বস্ত্র নেই….।"

ক্ষেন আপনার মত কত লোক তো ভাল ভাবে আছে—তাদের তো আপনার মত অবস্থা নয় ?

'আপনি ভারতবর্ষের কতজন লোক বের করতে পারবেন যারা ভালভাবে আছে—কোনো অভাব নেই তাদের ! আমি সাধারণ শিক্ষিত মানুষ, আপনাকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়ের বর্ণনা দিয়ে বলতে পারি, আজও ভারতের ৮০ (%) শতাংশ লোক চরম অভাবের মধ্যে দিন রাত্রি কাটাচ্ছে।'

তা হলে আপনি কি বলতে চান পঁচিশ বৎসরের স্বাধীনতায় আমরা বৃটিশ আমলের চাইতেও অভাবগ্রস্থ হয়ে পড়েছি ! বৃটিশ আমলে তো শতকরা ৭০ জন লোক অভাবগ্রস্থ এবং নানারূপ যন্ত্রনায় ছিল। এখন আপনি বলছেন '৮০ % শতাংশ লোক' বিভিন্ন সমস্যায় নিমজ্জিত ?

"হ্যাঁ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে পারছি আজও ভারতের গঠনমূলক কাজ কিছুই হয় নি।"

আচ্ছা এর জন্য আপনি বিশেষ করে কাকে দায়ী করেন ? সরকারকে না সরকারের নীতিকে ?

'স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের নীতির কোন সমালোচনা করার পক্ষপাতী নই। কারণ সরকারের নীতি সব সময়েই ভাল ছিল কিন্তু তা কার্যকরী করবার কোনরূপ বাস্তব পদ্ধতি আজও ভাল-ভাবে পেলাম না। পণ্ডিত নেহরুজীর বিশেষ বিশেষ কর্মব্যস্ততায় ভারতের কোন শ্রেণীর লোক লাভবান হয়েছে বলা মুশকিল। তবে আমার মনে হয় এবং আপনি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখতে পারেন এক শ্রেণীর ধনীরা স্বাধীনতার শুরু থেকেই সরকারকে ফাঁকি দিয়েছেন এবং সরকারও তাদের মদত দিয়েছেন ফলে পুঁজিপতিরা কোটি কোটি টাকার পাহাড় তৈরী করে নিচ্ছে। এজন্য নেহরুজী বার বার চিৎকার করেছিলেন, কিন্তু তার অধীনস্থ কর্মচারীদের দ্বারা বাস্তবতা কিছুই আনতে পারেন নি। অবশ্য নেহরুজী আক্ষেপও করেছিলেন যে তিনি তার মন্ত্রীসভার ব্যবহারে একেবারে বিরক্ত

এবং অস্বস্তিবোধ করতেন।'

আচ্ছা আপনি তো নেহরুর কথা বললেন, কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আপনি কিছু পরিবর্তন পাচ্ছেন কি?

'দেখুন, আমি রাজনীতি করি না, আগেই বলেছি বৃটিশ আমলের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ। আমার ধারণা ইন্দিরাজী কংগ্রেসকে ভেঙ্গে নতুন বর্ণের দ্বারা তাঁর চিরদিনের আদরের, ভালবাসার কংগ্রেসকে কতকগুলি সমাজতান্ত্রিক ইস্তাহারের দ্বারা গত ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন; আশা করি তিনি চাইবেন না তাঁর পিতার মত সমস্ত ইস্তাহারটাকে জিইয়ে রাখতে, যেমন তাজা মাছকে বেশীদিন আনন্দের সঙ্গে ভোক্ষণ করবার জন্য বার বার জল পালটিয়ে রাখা হয়।'

আপনি কি বলছেন? বড় বড় ব্যাংকগুলি জাতীয়করণ করে দিলেন, প্রাক্তন রাজাদের রাজন্যভাতা ধ্বংস করলেন,..... জীবনবীমা নিজের হাতে নিলেন—এতে কি জনসাধারণের সুবিধা হবে না বা হচ্ছে না?

'আমি তো পাচ্ছি না, দিন তো আপনি কোন ব্যাংক থেকে কিছু ঋণ এনে, ছোট খাটো ব্যবসা শুরু করি।'

আপনি আপনাকে নিয়েই বিচার করছেন কেন? অন্যান্যরা তো পাচ্ছে!

'অন্যান্যদের মধ্যে আমিও একজন—আমায় দিন।'

পাবেন। বিরাট দেশ, ঢেউ আসতে আসতে কিছু সময় নেবে।

'আপনি তো বললেন সময় নেবে। এতদিন গেল এখনও বলছেন সময় নেবে?'

সরকারের সাথে জনগণের সহযোগিতা না থাকলে সরকারের কাজকর্মের কতদূর অসুবিধা হয় জানেন?

'কেন জনগণ তো সর্বদাই সরকারের সমর্থনে আছে! আপনি

প্রমাণ দিতে পারেন পঁচিশ বছরের ইতিহাসে ভারতের জনগণ সরকারকে অসমর্থন করেছে ?'

না, গত কয়েক বছরে অর্থাৎ পণ্ডিত নেহরুর মৃত্যুর পর কংগ্রেসের মধ্যে কলহ বাঁধে। বিরোধীরা সুযোগ বুঝে ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে বেশ কয়েকটি রাজ্যে আসন পেতে বসে। তাই বলছিলাম এই পঁচিশ বছরে কংগ্রেসের একচেটিয়া শাসন ব্যবস্থা চলে নি।

'কিন্তু ১৯৬৭ সালের পূর্বে তো প্রায় বিশ বছর কংগ্রেস ছিল, তখন কি আপনি বলতে চান কংগ্রেস সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে ?'

যদি না পেরে থাকে তবে আমি বলব সেটা কংগ্রেসের দোষ নয়—আসল ব্যাপারটা হলো স্বাধীনতার পর থেকে সরকার কোথায় কিরূপ প্রবর্তন করবে তার বাস্তব হিসেব তৈরী করতে পারেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন একটানা পঁচিশ বছর তাঁদের হাতে থাকলে দেশকে গড়ে তুলতে পারতেন। যেমন এখন বলছেন, "দিকে দিকে ইন্দিরাজীর মহান আদর্শকে ছড়িয়ে দাও, বন্দেমাতরম্, জিন্দাবাদ

'তা হলে বিরোধী শক্তির কোনো অস্তিত্ব নেই বলতে চান ?'

কেন ?

'এই তো বললেন কিছুদিন বিরোধী শক্তি কংগ্রেসকে বাঁধা দিয়েছে —তাই—।'

না, না, বিরোধী শক্তিরা বিভিন্ন রাজ্যে বিধান সভার আসন লাভ করায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক এমন পর্যায়ে ছিল যাতে কেন্দ্র কোন কর্তৃত্বই রাজ্যের উপর করতে পারতো না। যেমন ধরুণ ১৯৬৭, '৬৮, '৬৯ এই কয় বছরে পশ্চিম বঙ্গের যুক্তফ্রণ্ট হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তো দিশেহারা হয়ে যাবার মত অবস্থা। এই রাজ্যের শতকরা ৭৫% ভাগ রাজস্ব যুক্তফ্রণ্ট সরকার কেন্দ্রকে দেবে না আর কেন্দ্রও যুক্তফ্রণ্টকে সুস্থির মাথায় রাজনৈতিক চেয়ারে থাকতে দেবে

না। তাই বলছি বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে এতদিন বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

'তবে আপনি বলতে চান এবার বিরোধী শক্তি নেই, সরকার তাঁদের প্রতিশ্রুতি মত কাজ করবেন?'

আশা করি করবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সহকারীদের মধ্যে এমন সব মন্ত্রীরা আছেন যাঁরা আজও নিজেদের সম্পদ এবং বিরাট বিরাট অট্টালিকার পরিকল্পনায় সরকারী অর্থ কাজে লাগাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর বিচক্ষণতা জনগণের মধ্যে তখনই সাড়া দেবে যখন সরকারী কর্তারা জনগণের মধ্যে মিশে যাবেন।

'কিন্তু এ'তো মহাত্মা গান্ধীর কথা বললেন! পঁচিশ বছরের ইতিহাসে আপনি কি এমন কোন প্রমাণ পেয়েছেন যে মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশিত পথে সরকার কাজ করেছেন?'

বলেছি নব রূপায়িত কংগ্রেস সরকার এবার অন্যরূপ—মাত্র শিশু—এখনও মায়ের দুধ ছাড়েনি—অসীম আশা ভরসা নিয়ে বড় হতে চাচ্ছে—তাও আবার বিদেশী শিক্ষায় নয়, আত্মনির্ভরশীলতায়—দেশীয় সম্পদে—বিদেশী বিদ্যালয়ে কিংবা বিদেশী মহাবিদ্যালয়েও যাবে না।

আচ্ছা আপনার সাথে তো অনেক কথা হলো! এই পঁচিশ বছরে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার কতদূর উন্নতি হয়েছে বলতে পারেন?

'বৃটিশ আমলের সাধারণ শিক্ষিত লোক আমি, তবে আত্মীয় পরিজন এবং আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি নজর দিলে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার কোন আশানুরূপ উন্নতি হয়েছে বলে মনে করি না। যে দেশের শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার চাইতে রাজনীতি ও দলীয় স্বার্থ এবং নিজের স্বার্থকে বড় বলে বিচার করেন সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হতে পারে? আদর্শগত শিক্ষা নেই বললেই চলে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান ক্রমশঃ নীচে নেমে যাচ্ছে অথচ অর্থের অপচয় হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই (সরকারের ও অভিভাবক-

দের)। ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ লোক শিক্ষার আলো পেয়েছে তার মধ্যে পল্লী অঞ্চলের ভাগ নিতান্তই কম। সরকারের দুর্বল নীতি বা অবহেলা যা'ই বলি না কেন এতে দেশের মান ক্রমশঃই বিলুপ্ত হচ্ছে। তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার শিক্ষার অবহেলিত চিত্র মারাত্মক রকমের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

এবার বলুন খাদ্য সমস্যার কথা।

'বৃটিশ আমলে সপরিবারে খাবার মত পুষ্টিকর খাদ্য পেতাম। স্বাধীনতার পর আজ পঁচিশ বছর অতীত হলো কোন প্রকার খাদ্যের সহজলভ্য হচ্ছে না। খাদ্যের অসম বণ্টন, অসাধু ব্যবসায়ীদের ফটকা ব্যবসা, প্রায় প্রতিটি খাদ্যে ভেজাল, এই নিয়ে ভারতের অসংখ্য লোক দিনের পর দিন কঠিন রোগে ভুগছেন। তারপর পশ্চিম-বঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি মারাত্মক, বাইরের লোক এই রাজ্যে বেশী আসলেও সরকার পরিমাণ মত চাউলের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ অন্যান্য রাজ্যের চাউল উৎকৃষ্ট ও সহজলভ্য। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রীরা কি পশ্চিম বঙ্গের প্রতি শুরু থেকেই এমন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার চালিয়ে যাবেন—এটাই আমাদের আগামী দিনের জিজ্ঞাসা (?) ; শিশুদের খাদ্য নিয়ে যে দেশে কালোবাজারী এবং অসাধুতা চলে সে দেশের সাধারণ চিত্র কি হতে পারে ?'

অর্থ-নৈতিক চিত্রটা আপনার কাছে কিরূপ লেগেছে ?

'পঁচিশ বছরের অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে এবং বিরোধী দল-গুলির মন্তব্য শুনলে (হয়তো আপনি জানেনও) দেখবেন কয়েকটি বিদেশী শক্তিশালী দেশের সাহায্যে ভারতের অর্থনীতি চলছে। একথা সরকারও স্বীকার করেছেন এবং বর্ত্তমান অর্থনীতিকে স্বধর্মে আনতে বেশ বেগ পেতে হবে—এটা তাঁরা জানেন। মনে করুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় তৈরী হবে—বিদেশের অর্থ না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু হতে পারে না। গরুর খামার তৈরী হবে—তাও বিদেশের অর্থ না হলে শুরু হবে না! তারপর বিভিন্ন মন্ত্রীদের বিভিন্ন খাতে বিদেশী অর্থ সঞ্চয় করে রাখা এবং বৃহৎ

পুঁজিপতিরা এই পঁচিশ বছরে দেশের অর্থভাণ্ডারকে যথেচ্ছো ভাবে কেড়ে নিয়েছে।'

কৃষি প্রধান ভারত আপনার কাছে পঁচিশ বছরে কেমন লেগেছে?

'সাধারণ কৃষকের অবস্থা পঁচিশ বছর পূর্বে যেমন ছিল আজ বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচার করলে দেখবেন কৃষকরা আরও সমস্যা জর্জরিত—। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের স্বার্থের জন্য কৃষকদের মধ্যে জাগরণ আনবার চেষ্টা করলেও আসলে কৃষকদের কিছুই লাভ হচ্ছে না। তারা পূর্বের মত অসহায় অবস্থা বোধ করছেন। সরকার চেষ্টা করলেও বিরোধীশক্তি অন্যরূপ চিন্তা করেন। ভূমিহীন কৃষকদের চাষের জমি দেবেন—এই কথা সব রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন সময়ে বলেছেন। কিন্তু হিসাব দিন তো ভারতের কত লোক নজের ইচ্ছামত চাষ করতে পারেন? সমবায় প্রথায় কৃষিকার্য করবার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত সফল হয়নি। বিভিন্ন তরফ থেকে কৃষকদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করানোর একটা বিরাট বাসনা সব সময়েই কাজ করছে। এই অবস্থায় সরকারের উচিত দেশের সমস্ত অনাবাদি জমি আইন করে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা। এটাই আশ্চর্য যে আজ পর্যন্ত ভারতকে বেশ পরিমাণ খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় এবং এর কারণ অণুন্নত কৃষি ব্যবস্থা।'

বেকার সমস্যার কিছু বলবেন?

'কিছু কেন? এটাই তো আসল সমস্যা। এর জন্য হাজার হাজার যুবক আজ বিভ্রান্ত রাজনীতির নোংরা তালিকায় নাম লেখাচ্ছেন—যদি কোন চাকরী জোটে। কিন্তু তাতেও কাজ হয় না। শিক্ষিত বেকার দেশের পক্ষে কতটা মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে তার হিসাব সরকার করছেন কি? বেকারদের কর্মসংস্থান হচ্ছে না। ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগর, আইনজ্ঞ ইত্যাদি কয়েক লক্ষ বেকার পথে পথে ঘুরছেন অথচ এক একটি পরিকল্পনায় কোটি কোটি

টাকা ব্যয় হচ্ছে। বেকারদের কর্মসংস্থান না হলে সমস্ত পরিস্থিতি টলমল হয়ে যাবেই—একথা সরকারের বিবেচনার প্রথম সারিতে রাখা দরকার।'

বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?

'বেশী না জানলেও বলতে পারি আজও পর্যন্ত ভারতের কোন পণ্য বিদেশের বাজারে প্রসংশিত হয় নি। দিনের পর দিন বিদেশ থেকে পণ্য আমদানী করে প্রচুর অর্থ বিদেশকে দিতে হচ্ছে অথচ নিজের দেশে চেষ্টা করলেই আমদানীকৃত দ্রব্য তৈরী করা যায়। বিদেশ থেকে মদ্য জাতীয় পানীয় আমদানী করে আমাদের দেশে আমাদেরই অর্থে পালিত বিদেশীদের পরিবেশন করা হয়। এমন কি বিদেশ থেকে মাছও আনবার চেষ্টা চলছে। এতে আমাদের অর্থের অপচয় ছাড়া আর কি? সরকার চেষ্টা করুন যাতে বৈদেশিক আমদানী বন্ধ করতে পারেন।'

শিল্প ব্যবস্থা কিরূপ?

'দেশীয় বড় বড় শিল্পের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। যে কয়টি বড় বড় শিল্প আছে তাতে লাভের অংক শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ বিদেশী শিল্পপতিরা বছরে বছরে কোটি কোটি টাকা আমাদের দেশ থেকে নিজেদের দেশে অনায়াসে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার এই বিদেশী শিল্পগুলিকে আজ পঁচিশ বছরের শেষেও যদি নিজেদের হাতে না নেন তবে দেশের অর্থনীতি আরও মার খাবে। ভারতে এতগুলি বিদেশী শিল্প আছে যার ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প উন্নতি লাভ করতে পারছে না। স্বাধীনতার পর থেকেই বিদেশী শিল্পের জাতীয়করণ একান্ত প্রয়োজন ছিল।'

ভাষা আন্দোলন নিয়ে এত কিছু হলো কিন্তু এখনও কি তার মীমাংসা হয়েছে?

'ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী করে দেওয়া এবং আঞ্চলিক ভাষার জোর হ্রাস করা সরকারের ভ্রান্ত নীতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই ভাষা আন্দোলনে কত লোক শহীদ হয়েছেন, কিন্তু আরো হবেন।

কারণ ভাষার এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা যে কোন সময় আগ্নেয়গিরির আগুনের মত জ্বলে উঠতে পারে। যেমন হিন্দী ভাষীদের কাছে হিন্দী না জানলে অন্যান্য প্রদেশের লোকদের প্রবেশ নিষেধ—এটা কতবড় অপমান—সরকারের পক্ষে তা বিবেচনা করতেই হবে। অথচ পশ্চিমবাংলায় ভারতের সব প্রদেশের লোক বাস করছেন—এখানে বাঙ্গালীরা বলেন না যে বাংলা শিখতেই হবে। পশ্চিম বাংলার কোন শিক্ষায়তনে বাংলা আবশ্যিক বিষয় নেই; কিন্তু হিন্দী ভাষাভাষীদের রাজ্যে হিন্দী শিখতেই হবে। এটা কি জুলুম না রাজনীতির খেলা ?'

'সম্প্রতি আসামে ভাষা দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষীদের জব্দ করবার জন্য সব সরকারি ষড়যন্ত্র কাজ করছে। কিন্তু ভাষার প্রশ্নে যদি বাঙালীদের এরূপ জব্দ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দ্বিতীয় পূর্ববঙ্গের মত অবস্থাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। অসমীয়দের স্মরণ রাখা উচিত তারা এখনও বাঙালীদের কৌশল (?) উপলব্ধি করতে পারে নি। বাঙালীদের সাথে হিংসার আশ্রয় বেছে নিলে অদূর ভবিষ্যতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাঙালী কারও করুণার অপেক্ষা করবে না।'

আচ্ছা বলুন তো জাতীয় সংহতি আছে কি না ?

'আপনি মাদ্রাজে গেলে আপনাকে বাঙ্গালী বলে ঘৃণা করবে, কাশ্মীরে যান, সেখানেও বলবে বাঙালী দুশমন, আসামে তো জানেন ১৯৬০ সালে বাঙালীদের নিধন যজ্ঞ শুরু করে ভেবেছিল বাঙালী একেবারে শেষ করে দেবে। তখন পণ্ডিত নেহরুজী বলেছিলেন বাঙ্গালীদের জন্য বেশী চিন্তা করলে লাভ হবে না—ওরা বরাবরই কলহ চায়, করুক ওদের কিছু ধ্বংস! সেবার আমরা (বাঙালীরা) ১৫ই আগস্টে শোক দিবস পালন করি। কিন্তু তবু দিল্লীর সংসদের টনক নড়ল না। আরো বললো পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতের স্বার্থ অনেক বেশী। কিন্তু আমরা প্রতিহিংসা নিলাম

না। অসমীয়াদের ভাই বলে বরণ করলাম। উড়িষ্যা'য় গেলেও বাঙালীর সম্মান নেই। তাহলে আমরা যাব কোথায়? স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্ণধার কে ছিল? কারা রক্ত দিল, কে মৃত্যু বরণ করল বেশী? কারা নেতাজীকে দিল…? কিন্তু বাঙালীর আজ চরম দুর্দিন—তাদের ঘরে বসে অন্যান্য প্রদেশের লোকরা বেশ খাবে, আনন্দ করবে, দেশে অর্থ পাঠাবে আর আমরা দিল্লীর কর্তাদের তাজা তাজা আপেলের মত রং এবং চেহারার দিকে তাকিয়ে আমাদের খালি পেটে হাত বুলাবো; এটাই কি জাতীয় সংহতি!'

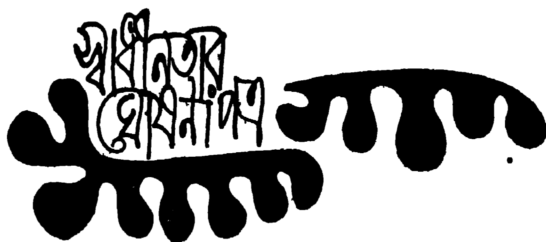
অনেক কিছু তো আপনি বললেন শেষ প্রশ্নটা বলুন তো ভারতের দারিদ্র্য দূর কিভাবে হতে পারে?

'এখনও পর্যন্ত যেভাবে চলছে এরূপ ভাবে চললে দেশের দারিদ্র্য দূর হবার কোন আশা আছে বলে আমরা মনে করি না। নির্বাচনের মাধ্যমে বড় বড় কথা বলে এবং পরিকল্পনার ঢাক ঢোল বাজিয়ে দারিদ্র্য দূর করা একেবারেই অসম্ভব। বড় বড় পুঁজিপতিদের আক্রমণ করে তাদের সঞ্চিত অর্থ বের করতে হবে, মন্ত্রী-দের বিলাস ত্যাগ করতে হবে। বড় বড় জনসভায় বক্তৃতা দিয়ে সরকার যদি মনে করেন দারিদ্র্য দূর করতে পারবেন তাহলে রাশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে কোন বিপ্লবই হোত না। সুতরাং প্রধানমন্ত্রীর গরীবি হটানোর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন বড় বড় শিল্পপতিদের ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের এবং মজুতদারদের হাতে কড়া দেওয়া এবং গরীবদের মধ্যে নিঃশর্তে দান করা। এটাই সাহসি-কতা এবং বাস্তবতার কাজ হবে।'

'প্রচার ব্যবস্থার মধ্যে এমন গলদ আছে যার ফলে দেশীয় বড় বড় সংবাদপত্রের দ্বারা জনগণ নিরপেক্ষ সংবাদ পান না। এবং এটা স্বাধীনতার শুরু থেকেই হচ্ছে। অথচ সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। প্রচার যন্ত্র নিরপেক্ষ হলে সরকারেরর পক্ষে প্রশাসন চালানো সহজ হবেই। অন্যথায় তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রের ভুল

এবং মিথ্যা সংবাদে মুষ্টিমেয় লোকের সুবিধা করে দিয়ে জনগণের বৃহৎ অংশকে ফাঁকি দিলে অদূর ভবিষ্যতে জনগণ আসল শত্রুকে রেহাই দেবে না।'

জনগণ স্বাধীন, দেশ স্বাধীন, সম্পদ স্বাধীন,
এই তিন স্বাধীনের কাছে কোন দুঃশাসন বেশীদিন
টিকে থাকতে পারবে না। জনগণের জয় হবেই।



এই গণপরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে ঘোষণা করিবার এবং ভারতের ভাবী শাসন-ব্যবস্থার জন্য এমন একটি শাসন-তন্ত্র প্রণয়ণ করিবার দৃঢ় ও পবিত্র সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে :

যে শাসনতন্ত্রের দ্বারা যে সমস্ত ভূখণ্ড লইয়া বর্তমানে ব্রিটিশ ভারত গঠিত, যে সমস্ত ভূখণ্ড লইয়া বর্তমানে দেশীয় রাজ্যসমূহ গঠিত, ভারতের যে সমস্ত অংশ ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্য সমূহের বহির্ভূত এবং যে সমস্ত ভূখণ্ড স্বাধীন সার্বভৌম ভারতে যোগদান করিতে ইচ্ছুক, সেইগুলিকে লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রের বলে উল্লিখিত ভূখণ্ডসমূহ—তাহাদের বর্ত্তমান সীমানাই বজায় থাকুক, কিংবা গণপরিষদ কর্তৃক তাহাদের সীমানা অন্যভাবে নির্ধারিত হোক এবং শাসনতন্ত্রের বিধি অনুসারে পরে তাহাদের সীমানা নির্দিষ্ট হোক,—স্বশাসিত অঞ্চলসমূহের মর্যাদা লাভ করিবে এবং তৎসহ কেন্দ্রে ন্যস্ত ক্ষমতাসমূহ ব্যতীত অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হস্তে যে ক্ষমতা অর্পিত হইবে অথবা যে সমস্ত ক্ষমতা স্বতঃই বর্তিবে, সেই সমস্ত ক্ষমতা ব্যতীত সরকারের ও শাসনব্যবস্থার সমুদয় ক্ষমতা ও কার্য এই সমস্ত অঞ্চল পরিচালনা করিবে ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রে সার্বভৌম স্বাধীন ভারতের, ইহাতে যোগদানকারী সমস্ত অংশের এবং শাসনব্যবস্থার অঙ্গসমূহের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উৎস হইবে জনসাধারণ ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রে ভারতের সর্বশ্রেণীর লোকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সুবিচার, মর্য্যাদা, সুযোগ ও আইনের সমানাধিকার চিন্তায় ও বাক্যে, উপাসনায় ও ধর্মবিশ্বাসে এবং নীতি ও আইনসম্মত ভাবে সঙ্ঘ গঠনে ও কার্য্য-অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেওয়া হইবে ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহ, অনুন্নত ও উপজাতি এলাকাসমূহ এবং অনুন্নত ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীসমূহের জন্য যথোপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে ; এবং—

যে শাসনতন্ত্রের বলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষিত হইবে, সভ্য জাতি সমূহের ন্যায় ও নীতি অনুযায়ী জল, স্থল ও অন্তরীক্ষের উপর ইহার সার্বভৌম অধিকার থাকিবে ; এবং—

এই প্রাচীন দেশ জগতে ইহার যথাযোগ্য সম্মানজনক স্থান লাভ করিবে এবং বিশ্বের শান্তি ও মানব জাতির কল্যাণ-বিধানে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিবে।

১৯৪৭

- গবর্ণর জেনারেলের বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর বেতার ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী স্বামী বিবেকানন্দ
  নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
  শ্রীঅরবিন্দ
  মহাত্মা গান্ধী

*বিস্তারিত সংবাদ নিয়েও পাওয়া যায়নি।

গবর্ণর জেনারেলের
বেতার ভাষণ

ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রথম গবর্ণর-জেনারেল রূপে লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ব্রিটিশের নিকট হইতে ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর কার্যের শেষ পর্ব সম্পন্ন করিবার জন্য অদ্য সকালে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পার্লামেণ্টের এক অধিবেশন হয়।

আমি আপনাদেরই একজন—লর্ড মাউন্টব্যাটেন।

তিনি বলেন,—"আজ হইতে আমি আপনাদের নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল। আমি আপনাদিগকে আপনাদেরই একজনরূপে আমাকে গণ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি ভারতবর্ষের স্বার্থ আরও পূর্ণভাবে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিব।

শক্তিশালী ভারত

তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিত নেহরুর বিচক্ষণ পরিচালনায় এবং তাঁহার মনোনীত সদস্যগণের সাহায্যে ও জনসাধারণের সহযোগিতায় ভারতবর্ষ শক্তিশালী ও প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হইয়া জগৎসভায় নিজের ন্যায্য স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

—এ, পি

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও হিংসা দূর করাই প্রথম কর্ত্তব্য

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী রূপে জাতির উদ্দেশ্যে প্রথম বেতার বক্তৃতায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, "আজ আমরা স্বাধীন জাতি এবং আমরা অতীতের বন্ধন হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছি।........"

"আপনাদের ইচ্ছানুযায়ীই আমি এই পদে আছি এবং যতদিন আমার উপর আপনাদের আস্থা থাকিবে ততদিনই আমি এই পদে থাকিব।"

"আজ জনসাধারণের অন্নবস্ত্র এবং আবশ্যক দ্রব্যাদির একান্ত অভাব এবং আমরা মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধির জালে জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।........"

আনন্দ বাজার পত্রিকা

স্বাধীন ভারত

১৪ই আগস্টের নিস্তব্ধ মধ্যরাত্র, বিপুল মহাদেশের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের শুভলগ্ন সমাগত প্রায়। একদিকে বৃটেনের রাজপ্রতিনিধি দুই শতাব্দীব্যাপী সাম্রাজ্যের প্রত্যর্পণ পত্র হাতে লইয়া দণ্ডায়মান, অপরদিকে জাতির নির্বাচিত প্রতিনিধি তাহা গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত। মধ্যরাত্র গত হইবামাত্র দেশশাসনের দায়িত্ব জাতীয় প্রতিনিধিদের হস্তে অর্পিত হইবে। আকাশের অতন্দ্র চন্দ্র-তারকা সে দৃশ্য অবলোকন করিবার জন্য নির্নিমেষ নেত্রে নিম্নে চাহিয়া আছে। দণ্ডে দণ্ডে পতাকা আপনাকে আস্তৃত করিবার জন্য আগ্রহ-ব্যাকুল প্রতি দুর্গচূড়ায় তোপ গর্জনোন্মুখ। মধ্যরাত্র অতিবাহিত হইবামাত্র বৃটেনের রাজপ্রতিনিধি শাসন শক্তির প্রত্যার্পণ পত্র জাতীয় প্রতিনিধির করে অর্পণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে চক্র-লাঞ্ছিত ত্রিবর্ণ পতাকা নৈশ আকাশে আন্দোলিত হইল, দুর্গ শীর্ষে তোপ গভীর গর্জনে সে বার্তা ঘোষণা করিল দিকে দিকে, কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল স্বাধীনতার বীজমন্ত্র—বন্দে মাতরম্, নবভারতের নবীন ঋক্—জয় হিন্দ্। কোটি কম্বু ও কোটি কণ্ঠের উদাত্ত নিঃস্বনে দীর্ঘ পরাধীনতার দুঃখরাত্র সহসা চকিত হইয়া উঠিল, দূর হইতে সুদূরে সে পলায়ন করিল জাতীয় পতাকার পবন-আকুল আন্দোলনের আঘাতে আঘাতে। সহসা অর্গলমুক্ত হইল উদয় তোরণের রুদ্ধদ্বার ভারতের স্বাধীনতা সূর্য কণক-কিরণ সমারোহে ধীরে ধীরে সমুদিত হইল প্রাচীদিগন্ত সীমায় শিহরিত বর্ণ-মর্মরে পাখীর কাকলীর গানে ও

নদীর কলহাস্যে সব প্রথম জাগিয়া উঠিল জাতীয় জীবনপ্রভাত। এই প্রভাত পূণ্য হোক, এ জাগরণ ধন্য হোক!

বৈদেশিক শাসন পাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য জাতি একদা মরণপণ সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছিল; সে পণ পূরণের জন্য সে সাধনা করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে, তাই সার্থকতা আজ তাহার করতল গত। যে শহীদগণ এই ব্রতের বেদীমূলে আত্ম-নিবেদন করিয়াছেন যাঁহাদের ত্যাগ ও আত্মদান জাতীয় সাধনাকে সফল ও সার্থক করিয়াছে, নব জাগরণের ব্রাহ্ম মুহূর্তে জাতি আজ তাহাদিগকে সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিতেছে। আমরা জানি জাতির চরম লক্ষ্য আজও অনুপলব্ধ, বিভক্ত-দেশ ও জাতির মর্মবেদনা তাহাও আমরা অন্তর দিয়া অনুভব করি; কিন্তু সে বেদনা বক্ষে বহিয়াও শাসনের পাষাণ চাপ বুক হইতে স্খলিত হইবার ফলে যে মুক্তি ও স্বস্তি জাতি আজ অনুভব করিতেছে—তাহাই তাহার পক্ষে একান্ত বাস্তব উপলব্ধি। আমাদের জাতীয় জীবনে ব্যাথা আছে, বঞ্চনা আছে, বিড়ম্বনা আছে; তথাপি বলিতে হইবে জীবন প্রভাতের এই আনন্দ-অনুষ্ঠান অম্লান হোক অতাপবিদ্ধ হোক। ব্যক্তির মত জাতির জীবনেও এমন একদিন আসে যখন আলোকে বাতাসে মধু ক্ষরে, বিশ্বভুবন মধুময় বলিয়া মনে হয়। আমাদের জাতীয় জীবনে আজ সেই শুভ দিন সমাগত; এই দিনটি গত হইলে দৈনন্দিন কার্যক্রমের চক্র-নেমীর নিয়মিত ঘর্ঘর শব্দ আবার বাজিয়া উঠিবে, কিন্তু আজিকার এই আনন্দ অনুষ্ঠানের অম্লান অঙ্গনে তাহার কঠোর ও কর্কশ ধ্বনির প্রবেশাধিকার নাই।

স্বাধীন ভারতের নব জাগরণ একান্তভাবে ভারতীয় ব্যাপারই নয়, বিশ্বের দরবারেও তাহার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণক্লান্ত পৃথিবী অঙ্গের শোণিত প্রলেপ শুষ্ক হইতে না হইতে তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের অভিমুখে অনিবার্য বেগে অগ্রসর। জার্মানী পরাজিত, জাপান পর্যুদস্ত, কিন্তু নাৎসীবাদ আজও মরে নাই; তাহার ধ্বংসধূলি বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। গত মহাযুদ্ধের

পরাজিত ফরাসী এবং ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ অক্ষম ও অরক্ষিত রাষ্ট্রের বুকে জ্বলন্ত আক্রোশে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আর বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নিরিক্ষণ করিতেছে সেই বীভৎস তাণ্ডব। পরাধীন ভারত এতদিন তাহার নৈতিক সত্ত্বা প্রয়োগ এই জঘন্য বর্বরতার বিরুদ্ধে, স্বাধীন ভারত তাহার সামগ্রীক শক্তি লইয়া যখন দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবে, তখন তাহার হস্তক্ষেপ অবহেলা ভরে উপেক্ষা করা তেমন সহজ সাধ্য হইবে না। আন্তর্জাতিক শক্তির মানদণ্ডের সমতা রক্ষার গুরুদায়িত্ব ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রলোভী কোন দেশ যখন ঐ আন্তর্জাতিক শক্তির মানদণ্ডের ভারকেন্দ্র বিচলিত করিবে, তাহার সমতা সংস্থাপন করিবে স্বাধীন শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক ভারতীয় রাষ্ট্র। স্বাধীন ভারতের সমুন্নত তাই জাতির সম্পদ, আন্তর্জাতিকতার সহায়। নবীন ভারতের জাগরণকে তাই যুগ প্রভাতের অরুণ আলোকে অভিনন্দিত করিতেছি।

যুগান্তর

১৫ই আগস্ট

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার স্বাধীনতা সূর্য্য পলাশী প্রান্তরে ডুবিয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের বিশ্বাসঘাতকতার মারাত্মক অস্ত্রাঘাতে লর্ড ক্লাইভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের সেই ইতিহাসের পর প্রায় দুই শতাব্দী অতিক্রান্ত হইতে চলিল। এই দুই শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষসহ প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীর উপর বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, যে সাম্রাজ্য সূর্য্য কখনও অস্ত

যাইত না। কিন্তু বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য্য অস্ত না গেলেও এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বর্ণরশ্মি দিগন্ত মুখরিত করিলেও ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবন হইতে আলোক নিভিয়া গিয়াছিল। পলাশীর ১০০ বৎসর পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অস্ত্রধারী ভারতীয় সিপাহীগণ 'বিদ্রোহ' বাধাইয়া নষ্ট স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তাহা সফল হইল না। তারপর আর এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে —১৯৫৭ খৃস্টাব্দ বেশী দূরবর্ত্তী নহে, মাত্র ১০ বৎসর বাকী। ইতিমধ্যে ইতিহাসের কিছু অঘটন ঘটিয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞান ও শিল্প-বিপ্লব সাম্রাজ্যের ও বাণিজ্যের উপর ভর করিয়া উনবিংশ শতাব্দী হইতে বার বার ভয়াবহ যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক মৃত্যু ও ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধ, বুয়োর যুদ্ধ এবং ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকার তুমুল আলোড়ন আনিয়াছিল যে বাঙ্গলায় স্বাধীনতা-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছিল, সেই বাঙ্গলা দেশেই ১৯০৫ সালে বাঙ্গালী ছেলে-মেয়ে স্বদেশীর দীক্ষা গ্রহণ করে। সাহিত্যিক, শিল্পী ও চারণ কবির-দল বাঙ্গালীকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভের জন্য প্রেরণা জোগায়। ধর্ম্মবিদ্, সমাজবিদ্ ও রাজনীতিকগণ বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনাকে দাসত্বের পঙ্কতিলক মুক্ত করিয়া রক্ততিলক পরাইয়া দেন। বাঙ্গলাদেশ সারা ভারতবর্ষকে এক নূতন জাগরণী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিল। আপন হৃদপিণ্ড ছিন্ন করিয়া বাঙ্গলার যুবক পলাশীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল। সেই আন্দোলনের ঢেউ ভারতীয় জনসমুদ্রে এক নূতন প্রবাহ আনিল এবং ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ভারতীয় ইতিহাসের এক যুগসন্ধি সৃষ্টি করিল।

মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটিল। সত্যাগ্রহ ও অহিংসার এক অভাবনীয় অস্ত্র লইয়া তিনি ভারতীয় জনসাধারণকে 'ব্রিটিশ শাসনের শয়তানির' বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর বিদ্রোহে আহ্বান

করিলেন। উহার বহুদিন পূর্ব্বেই জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল —১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু কেবল আবেদন-নিবেদন, ইংরাজী ভাষার মনোহর বক্তৃতা এবং শব্দগত বাগড়ম্বরের দীর্ঘ প্রস্তাবের মধ্য হইতে গান্ধীজীই প্রথম কংগ্রেসকে একটি সক্রিয় ও সংগ্রামশীল গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। কটীবস্ত্রধারী রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হিন্দু-মুসলমান-শিখ-খৃষ্টান-পার্শী-বৌদ্ধ সর্ব্বধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষকে জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করিলেন। সেই মহা ঐক্যে মহাবাণীর প্রেরণায় হিন্দু-মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলাইল। নিপীড়িত ও নির্য্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য সত্যাগ্রহ অভিযান সুরু হইল। আন্তর্জাতিক জগৎ বিস্ময়ের সহিত দেখিল একটি নিরস্ত্র ক্ষুদ্র মানুষ যাঁহাকে বৃটিশ সাম্রাজবাদী অর্দ্ধনগ্ন ফকির বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন, সেই মানুষটির অঙ্গুলি হেলনে কামান-বন্দুক-বোমারু-করধৃত বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্য নিরুপায় বোধ করিতেছে। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগে মেসিন-গানের গুলীবর্ষণে যে হত্যাকাণ্ডের সুরু ১৯৪২ সালে এরোপ্লেন হইতে বোমাবর্ষণে তার পরিণতি। যাহা কিছু অস্ত্র দমননীতির তুণীরে ছিল সমস্তই বর্ষিত হইয়াছে মুক্তিকামী ভারতবাসীর উপর। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের মৃত্যু ঘটে নাই। ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা বৃটিশ শাসকের নিকট আত্মসমর্পন করে নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর সর্ব্ব ভারতের জাগরণ এবং দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের পর সর্ব্ব ভারতে গণবিপ্লবের অগ্নিশিখা। সেই শিখার সঙ্গে যুক্ত হইল পৃথিবীব্যাপী নির্য্যাতিত ও পরাধীন মানুষের মুক্তি কামনা। মধ্য প্রাচ্যের ভুমধ্যসাগরীয় তীর হইতে এশিয়ার পূর্ব্ব দিগন্তের প্রশান্ত মহাসাগরের কূল পর্য্যন্ত কোটি কোটি মানুষের জয়যাত্রার ধ্বনিতে সাম্রাজ্যবাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ১৯১৭ সালে ইউরোপের আকাশে ধূমকেতুর মত দেখা দিয়াছিল সোভিয়েট রাশিয়া। তার রক্তাক্ত-বিপ্লব, গণ-বিপ্লব ধনিক সমাজকে ভীত ও চমকিত করিল। চীন ও ভারতবর্ষের বিপ্লবীমন গণসমুদ্রের সেই

প্রলয়ঙ্কর উচ্ছ্বাসকে দূর হইতে নমস্কার জানাইল। রাশিয়া, এশিয়া ও ভারতবর্ষের মধ্যে এক অজ্ঞাত মানসিক যোগসূত্র অলক্ষ্যে গড়িয়া উঠিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সেই অলক্ষ্য যোগসূত্র বিজয়ী সোভিয়েট রাশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া এশিয়ার অগণিত মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ দুর্গের উপর আঘাত হানিবার দুঃসাহসিক উদ্দীপনা আনিয়া দিল। বৃটেনের সমাজ-জীবনে এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। গোঁড়া রক্ষণশীল দলের পরিবর্ত্তে সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিকদলের রাষ্ট্রীক অভ্যুত্থান ঘটিল এবং ভারতীয় গণ-বিপ্লবের সম্মুখীন না হইয়া তাঁহারা উহার সহিত আপোষের ও শান্তির পথ খুঁজিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন—ঐ দিন ভারতবর্ষ বৃটেনের সর্ব্বপ্রকার শাসন মুক্ত হইয়া আপন রাষ্ট্রীক স্বাধীনতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।

১৫ই আগস্ট প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ শাসনের অবশান ঘোষণা করিল। নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইহা লাল তারিখ। মানচিত্রের পৃষ্ঠা হইতে বৃটেনের সাম্রাজ্য চিহ্নের রক্তবর্ণ আজ মুছিয়া গেল ৪০ কোটি মানুষের দেশে ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে অশোক চক্র লাঞ্ছিত ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পতাকা উত্তোলিত হইল। লক্ষ লক্ষ নর-নারী এই পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য মহৎ প্রতিশ্রুতি স্বাক্ষর করিবে এবং একটি স্বাধীন উন্নত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার দ্বারা পৃথিবীর সভ্য মানুষের সমাজে আপন ন্যায্য অধিকার আদায় করিয়া লইবে। যুদ্ধের জন্য নয়—শান্তির জন্য, হিংসার উদ্দেশ্যে নয়—ভালোবাসার জন্য। শোষনের দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া নয়—সর্ব্ব মানুষের কল্যানের জন্য এই নূতন ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এই সমাজের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য অশিক্ষা, কুশিক্ষা, অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অকাল মৃত্যু, ব্যাধি ও মহামারী বৃটিশ শাসনের এই কলঙ্কিত চিহ্নগুলিকে নিঃশেষে মুছিয়া ফেলিবার জন্য আবার আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইবে। রাষ্ট্রীক স্বাধীনতার পর সর্ব্ব মানুষের মুক্তির সাধনার ব্রত আমাদের বলিষ্ঠ হাতে গ্রহণ করিতে হইবে এবং জাতীয় জাগরণের উদয়ের পথে যে কল্যাণের

বাণী আমরা শুনিয়াছিলাম, তাহা কেবল বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের অধঃ-পতিত জনসমাজের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যই নয় সারা পৃথিবীর দুর্গত মানুষের মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য—ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সর্ব্ব মানুষের কল্যানকেই মুক্তি পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেই মহৎ ঐতিহ্যের অধিকারী রূপে আমরা মানব সভ্যতার এক নূতন জয়-যাত্রার বাণী আগামীকালের ইতিহাসে প্রতিধ্বনিত করিয়া যাইব।

বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষে যে বিচ্ছেদ আসিয়াছে উহাকে আমরা অন্তরে অন্তরে স্বীকার করি না। হিন্দু ও মুসলমান এই বাঙ্গলা দেশ ও ভারতভূমির যুগ যুগান্তরের সন্তান। নূতন রাষ্ট্রের দ্বারা তাহাদের মধ্যে বাহ্যিক বিভেদ সৃষ্টি হইয়া থাকিলেও আমরা একই রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। সেই রক্তের ঋণ একদা শোধ দিতে হইবে। যদিও বৃটিশ পরাধীনতার মূল্য স্বরূপ সেই রক্তের বন্ধন শিথিল হইয়াছে। আজ সাম্রাজ্যবাদের অবসান দিনে আমরা পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গের ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের সমস্ত মুস্লিম নরনারীকে আমাদের আন্তরিক শুভ কামনা এবং প্রীতি জানাইতেছি। সংখ্যালঘু হিন্দু ও শিখদিগকে হৃদয়ের বেদনার সঙ্গে মনুষ্যত্বের অঙ্গীকারও জানাইতেছি। তাহাদের সুখ-দুঃখের নিবিড়তার সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য বন্ধনকে স্বীকার করিতেছি এবং ভ্রাতৃত্ব বোধের গভীরতর অনুভূতির দ্বারা পুনরায় মহৎ মিলনের জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁহারা আত্মবলি দিয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া অপরিমিত বেদনার বিষপাত্র পান করিয়াছেন, ঐহিকের সর্ব্ব সুখ জলাঞ্জলি দিয়া যাঁহারা সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য দুশ্চর তপস্যায় আত্মনিবেদন করিয়াছেন সেই সমস্ত খ্যাতনামা ও অখ্যাত, কীর্ত্তিমান ও অবজ্ঞাত সমস্ত সৈনিকের উদ্দেশ্যে আজ আন্তরিক অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি!—জয়হিন্দ্!

—বিপ্লবী ভারতের-জয় হোক্!!—

বাণী …

হে ভারত-সন্তানগণ আমি তোমাদিগকে আজ কতকগুলি কাজের কথা বলিতে আসিয়াছি, আর ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে—কেবল তোমাদিগকে প্রকৃত পথে কার্যের আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছু নহে। আমাকে লোকে অনেকবার বলিয়াছে, পূর্ব গৌরব-স্মরণে কেবল মনের অবনতি হয় মাত্র উহাতে কোনো ফলোদয় হয় না—সুতরাং আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করিতে হইবে। সত্য কথা। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পার পশ্চাদ্দৃষ্টি কর পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরণী প্রবাহিত প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর তারপর সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ-গৌরব শিখরে আরূঢ় হইয়াছিল তাহাতে তদপেক্ষা উচ্চতর উজ্জ্বলতর মহত্তর মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর। আমাদের পূর্ব পুরুষগণ মহাপুরুষ ছিলেন, আমাদিগকে প্রথমে ইহা জানিতে হইবে আমরা কি উপাদানে গঠিত, কোন রক্ত আমাদের ধমণীতে প্রবাহমান। তারপর সেই পূর্বপুরুষগণ হইতে প্রাপ্ত শোণিতে বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাদের সেই অতীত কার্যে বিশ্বাসী হইয়া সেই বিশ্বাস বলে সেই অতীত মহত্বের জ্বলন্ত ধারণা হইতেই পূর্বে যাহা ছিল তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠতর নূতন ভারত গঠন করিতে হইবে।

অন্যান্য দেশের সমস্যাসমূহ হইতে এই দেশের সমস্যা জটিলতর, গুরুতর।

এক ধর্ম—একথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খৃষ্টান বা মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে হিসাবে "এক ধর্ম" বিদ্যমান, আমি সে হিসাবে "এক ধর্ম" কথা ব্যবহার করিতেছি না। আমরা

জানি আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমূহ যতই বিভিন্ন হোক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবী থাকুক তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায় আছে যাহাতে সকল সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কার্যের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকে।

আমরা জানি ভারতবাসীর ধারণা—আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছুই নাই—ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ

যে স্বপ্ন দেখে আমরা বিভোর হয়েছি, তা শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমরা চাই ন্যায় ও সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। আমরা চাই একটা নূতন সমাজ, এক নূতন রাষ্ট্র—যার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠবে জীবনের শ্রেষ্ঠ ও পবিত্রতার আদর্শগুলি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

বঙ্গদেশ ভারতের নেতা; বঙ্গদেশের দৃঢ়তা, সাহস ও কর্ম-কুশলতায় সমস্ত ভারতের উদ্ধার হইবে, নচেৎ হওয়া অসম্ভব।

শ্রীঅরবিন্দ

জনকতক ব্যক্তি ক্ষমতা পেলেই তাতে প্রকৃত স্বরাজ আসবে না। প্রকৃত স্বরাজ তখনই অর্জিত হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করবার শক্তি যখন অর্জন করবে সবাই। অর্থাৎ স্বরাজ লাভের জন্য জনসাধারণকে ক্ষমতা পরিচালনে এবং ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

স্বরাজ বলতে আমি বুঝি ভারতের অতি হীন ব্যক্তিরও স্বাধীনতা। ভারতকে শুধু বৃটিশ শাসনমুক্ত করতেই আমি উৎকণ্ঠিত নই। যে কোন প্রকার বন্ধনদশা থেকে ভারতকে মুক্ত করাই আমার লক্ষ্য। এক উৎপীড়ন দূর করে সেখানে অন্য উৎপীড়ন আমদানী করতে আমি চাই না।

....বৃটিশকে ভারত থেকে বিতাড়িত করলেই তদ্দ্বারা ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হবে না।

জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাজন্যবৃন্দ এবং ধনী সমাজ যেমন ভোগ করবে, তুমিও তেমন ভোগ করবে। এর অর্থ এই নয় যে, এদের যেমন প্রাসাদ আছে, তেমন প্রাসাদ থাকার প্রয়োজন। সুখের জন্য এর প্রয়োজন হয় না। ওর মধ্যে তুমি এবং আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলব। কিন্তু কোন ধনী ব্যক্তি যে সকল সাধারণ সুখ সুবিধা ভোগ করে তা তোমাব থাকা প্রয়োজন। স্বরাজলাভের ফলে যদি এ না পাওয়া যায় তবে সে স্বরাজ যে পূর্ণ স্বরাজ নয় তাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

ধর্ম বলতে ধর্মের সর্বোচ্চ আদর্শ যা তাই আমি বুঝি। এর মধ্যে আছে হিন্দুর হিন্দু ধর্ম, মুসলমানের ইসলাম, খৃষ্টানের খৃষ্টধর্ম— আবার এদের সবার উপরে এ ধর্ম। একে বলা যায় স্বরাজের বর্গ-ক্ষেত্র, কোন একটি কোন সঠিক না হলে এ আর স্বরাজ থাকবে না।

মহাত্মা গান্ধী

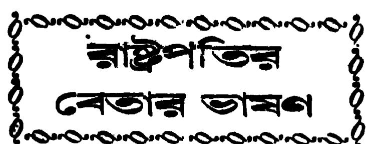
১৯৪৮

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর*
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী   মহাত্মা গান্ধী

*বিস্তারিত সংবাদ নিয়েও পাওয়া যায়নি



সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি করিতে হইবে

ভারতের গবর্ণর জেনারেল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা গোপলাচারীর বেতার বক্তৃতা

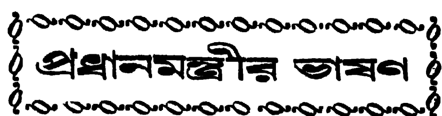
নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট—"আমাদের দেশের সমৃদ্ধ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পথের সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও নাগরিকের শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্যবোধ জাগ্রত করিয়া আমাদের উৎপাদনের মান বৃদ্ধি করিতে হইবে।"

রাজাজী বলেন, "আমার স্বদেশ মাতৃকা চান সর্বাধিক উৎপাদন, পারস্পরিক বিশ্বাস ও সাধুতা।"

"আমি নাগরিকদিগকে ক্রমাগত এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিব— "আমরা কি আমাদের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সক্রিয় সহযোগিতা করিয়াছি? যদি সন্দেহ কিছু থাকে, তবে তাহার নিরসন করা অবিলম্বে প্রয়োজন। আমাদের চিন্তা গঠন মূলক হওয়া উচিত।"

তিনি বলেন, "আমাদিগকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। তন্তুবায়, কৃষক, ব্যবসাদার—সকলকে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে হইবে—সেখানে যেন কোনো প্রবঞ্চনা, কোনো আলস্য থাকে না। সকলের কার্যের উপর দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নির্ভর করিতেছে।"

—এ, পি, আই



স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতে জনসাধারণের দাবীই সর্বাগ্রে গণ্য

স্বাধীনতা লাভের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে পণ্ডিত নেহরুর বেতার বক্তৃতা

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগষ্ট—ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন যে, "স্বাধীন ভারতে জনসাধারণের স্বার্থই সর্বাগ্রে গণ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার লাঘব না হইলে স্বাধীনতার অর্থ হয় না। সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে এবং ভারতে ও সমগ্র বিশ্বব্যাপী ব্যাপক সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা সম্বন্ধে জনরবও রটিতেছে। আমাদের সকল প্রকার জরুরী অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। জাতির সম্মুখে যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন নিঃশঙ্কচিত্তে এবং পুরস্কারের আশা না করিয়া জাতির সেবা করাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

তিনি বলেন, "দেশের যুব সমাজের নিকট আমি বিশেষ আবেদন জানাইতেছি; তাহারাই আগামীকালের নেতা, দেশের স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষার ভার তাহাদেরই উপর বর্তাইবে।"

—এ, পি,

আনন্দবাজার পত্রিকা

স্বাধীনতার সম্বৎসর

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার এক বৎসর পূর্ণ হইল। স্বাধীনতা লাভের এই বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠান কিভাবে প্রতিপালিত হইবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এক বিবৃতিতে তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠান যে দেশব্যাপী আনন্দোৎসবের উপলক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পথে যে আঘাত ও বেদনার মধ্য দিয়া আমরা আসিয়াছি এবং এখনও যাহার সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে নাই, তাহা স্মরণ করিয়া রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন :—

> "উৎসবের উপলক্ষ্য হিসাবে ১৫ই আগষ্টের অনুষ্ঠান প্রতিপালন অপেক্ষা স্মৃতিবাসর হিসাবে উহার অনুষ্ঠানই অধিকতর সঙ্গত। স্বাধীনতা লাভের জন্য আমাদিগকে যে ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে হইয়াছে, তাহা আজ আমরা স্মরণ করিব এবং দেশের ও দেশবাসীর সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিব।"

রাষ্ট্রপতির এই বাণী অদ্যকার অনুষ্ঠানে আমাদের বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে দ্রুত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য যে পথ অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতবর্ষ তাহা হইতে ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়াছিল।

অহিংসা ও সত্যাগ্রহকে অবলম্বন করিয়া পরাধীনতা হইতে মুক্তি লাভ করিবার যে পথ গান্ধীজী নির্দেশ করিয়াছিলেন পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে তাহা এক অভিনব আদর্শ এবং উৎপীড়িত মানব সমাজের সম্মুখে মুক্তি সাধনার ও মুক্তিলাভের এক অপ্রত্যাশিত পদ্ধতি। এই অভিনব আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি অবলম্বনের ফলেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ দ্রুততর হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মহাত্মাজী আমাদিগকে যে আদর্শে এবং কর্ম সাধনার যে নীতিতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আমরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। ফলে যে শক্তিকে জাগাইয়া মহাত্মাজী সম্পূর্ণভাবে দেশের কল্যান সাধনাতেই নিযুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আত্মঘাতী সঙ্ঘর্ষে আপনার ক্ষয় ও অপচয় ঘটাইয়াছে। ভেদবুদ্ধি প্রাবল্যলাভ করিয়াছে এবং স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া এমন ঘটনা ঘটিয়াছে যাহার আঘাত ও বেদনা আমরা এখনও ভুলিতে পারি নাই। শীঘ্র যে পারিব, তাহার সম্ভাবনাও নাই। রাষ্ট্রপতির বানী স্বাধীনতার বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে এই কথাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে এবং যাহাতে অনুরূপ ঘটনার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা চিরকালের জন্য নিবারিত হয়। তৎসম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়াছে। আজ শুধু বর্তমানের অনুষ্ঠান পালন করিলেই আমাদের কর্তব্য সম্পূর্ণ হইবে না ভবিষ্যতের দায়িত্ব সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিতে হইবে এবং তাহা পালনের সঙ্কল্পও গ্রহণ করিতে হইবে।

স্বাধীনতা লাভের এই বৎসর যে দুই ঘটনার জন্য ভারতবর্ষের ও পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে তাহা হইল ভারতবর্ষের খণ্ডন ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনাবসান—এক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হইতে অন্য ঘটনার উদ্ভব। ঘটনাচক্রে বাধ্য হইয়া দেশ খণ্ডনের প্রস্তাব কংগ্রেস স্বীকার করিয়া লইয়াছিল; কিন্তু ইহা হইতে যে হলাহল উঠিবে তাহা উপলব্ধি করিয়া তাহা পান করিবার জন্য মহাত্মাজী

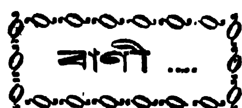
আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আত্মঘাতী সঙ্ঘর্ষে সমূহ ধ্বংসের সম্ভাবনা হইতে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করিবার চূড়ান্ত প্রচেষ্টায় তিনি আপনাকে আহূতি দিয়াছিলেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে আসিয়া তাঁহার মহিমময় চরিত্র উহার স্বাভাবিক মহিমাকে ছাড়াইয়াও যে উর্দ্ধে উঠিয়াছে, মানবজাতি তাহা দেখিয়া ধন্য হইয়াছে এবং বহু দুঃখ ও ক্ষোভের মধ্যে মহাত্মাজীকে আকস্মিক-ভাবে হারাইবার অসহণীয় শোক যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার জীবন ও চরিত্রের এই লোকাতিত মহিমা আমাদিগকে সান্তনা দিয়াছে। আশ্বাস দিয়াছে এবং অবলুপ্ত প্রায় আত্মবিশ্বাস পুনরায় ফিরাইয়া আনিয়াছে। যে দেশ ও জাতির সাধনা হইতে মনুষ্যত্বের এত বড় বিরাট আদর্শের উদ্ভব ঘটিয়াছে, সে দেশ ও জাতি সাময়িকভাবে যতই বিব্রত বা বিভ্রান্ত হউক না কেন তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকার নহে।

রাষ্ট্রপতির বাণী ইহাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দিল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল দুঃসাধ্য সমস্যা ভারতবর্ষকে পরিবেষ্টন করিয়াছিল আমরা অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে তাহা কাটাইয়া উঠিতেছি। ভারতবর্ষ পুনরায় আপনার সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছে, আত্মস্থ হইতেছে। ইহাও আমরা নিঃসংশয়ে আশা করিতে পারি যে, ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতিকূলে যে সকল শক্তি এখনও সক্রিয় ভারতের নৈতিক শক্তির প্রভাবে তাহাদের ক্রিয়া শীঘ্রই স্তব্ধ হইবে। এই নৈতিক শক্তির উপরে স্থির বিশ্বাসে দাঁড়াইয়া নব-রাষ্ট্রের জনক মহাত্মাজী আমাদিগকে পুণঃ পুণঃ নির্দেশ দিয়াছেন। সম্প্রতি ছাত্র সমাজের নিকট স্বাধীনতা দিবসের বাণী প্রদান করিতে গিয়া মহাত্মাজীর একনিষ্ঠ অনুগামী পণ্ডিত জওহরলাল জানাইয়াছেন এই নৈতিক ভিত্তি হইতে ভারতরাষ্ট্র বিচলিত হইবে না। ইহাই আমাদের অদ্যকার সঙ্কল্প হইবে। মহাত্মাজী মানব সমাজকে নূতন পথের সন্ধান দিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার নির্দেশিত আদর্শ ও

কর্মনীতিতে স্থির থাকিয়াই ভারতবর্ষ সে সন্ধান দিতে পারিবে।

অদ্যকার অনুষ্ঠানে আমাদের পক্ষে একযোগে অতীতের স্মৃতি, বর্তমানের উপলব্ধি এবং ভবিষ্যৎ গঠনের সঙ্কল্প গ্রহণের উপলক্ষ্য। অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের এই মহাসন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া নব-জাগ্রত ভারতবর্ষের প্রতি কর্তব্য পালনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করিতেছি। ইহার মধ্যে শৈথিল্য নাই, কর্ম বিমুখতা নাই, নিষ্ঠাহীনতা নাই বা আদর্শভ্রষ্টতা নাই। পরাধীন ভারতবর্ষে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত ছিল আজ তাহা শতগুনে বর্ধিত হইয়াছে। সেই দায়িত্ব গ্রহণে ও পালনে ভারতের অন্তরাত্মার প্রেরণা এবং মহাত্মাজীর আশীর্বাদ আমাদের সহায় হউক।

বন্দেমাতরম্ !!



আমার কথা যদি চলে, তবে বলি, আমাদের রাষ্ট্রপাল এবং প্রধানমন্ত্রী আসিবেন কিষাণদের মধ্যে হইতে। বাল্যকালে পাঠ্য পুস্তকে পড়িয়াছিলাম যে, কিষাণরাই পৃথিবীরাজ্যের উত্তরাধিকারী। যাহারা কৃষিক্ষেত্রে পরিশ্রম করে এবং নিজ হাতে উৎপন্ন ফসল হইতে অন্ন করিয়া লয়, এই কথা তাহাদের সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ উচ্চপদের যোগ্য হইতে হইলে, নিরক্ষর থাকিলেও কৃষকের সাধারণ বুদ্ধি বলিষ্ঠ হওয়া চাই, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেষ্ঠ সাহসিকতা থাকা চাই, চারিত্রিক শক্তি অখণ্ড ও নির্দোষ হওয়া চাই এবং স্বাদেশিকতায় তাহাদের সন্দেহের অতীত হওয়া চাই। ধনের প্রকৃত উৎপাদক বলিয়া তাহারাই হইল আসল মালিক বা প্রভু, অথচ আমরা তাহাদিগকেই চাকর করিয়া রাখিয়াছি।

মহাত্মা গান্ধী

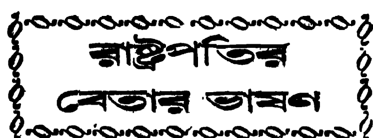
১৯৪৭

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।



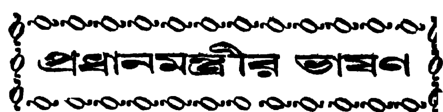
দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা

স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্ত্তী রাজা গোপালাচারী জাতির উদ্দেশে নিম্নলিখিত বাণী প্রদান করেন—

"আমরা বর্ত্তমানে নানাবিধ জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছি। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার সমূহ এই সমস্যা সমাধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। যে সব নীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ সরকারের সহিত একমত সেগুলিও কাযকরী করিতে অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে। জনগণ যদি এই সকল অসুবিধার বিষয় উপলব্ধি করিয়া সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করেন তবেই এই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করা সহজ হয়।

কর্ত্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করুন

"গণতন্ত্রের অর্থ ইহা নহে যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ খেয়াল মত কাজ করিয়া যাইবে। জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আমাদের দেশের আয়তন এত বৃহৎ এবং আমাদের জনসংখ্যা এত বেশী এবং জনগণের স্বভাবও এরূপ যে, প্রাচীনকালে স্বৈরশাসকগণ যেরূপ ভাবে স্বীয় কর্তৃত্ব রক্ষা করিতেন আমরাও যদি সেইরূপ যত্ন ও উৎসাহ লইয়া আমাদের গণতন্ত্রের কর্তৃত্ব রক্ষা না করি তবে উহা ধ্বংস হইবে। কর্তৃত্ব কাহারও হাতে থাকিবেই। সুষ্ঠভাবে এই কর্তৃত্ব পরিচালনা করিতে হইবে।



হিংসা ও উচ্ছৃঙ্খলতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইতে হইবে

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বাণী

"আগামী বৎসরেই ভারতবর্ষ সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করিবে এবং ভারতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় রচিত হইবে। যে ভারতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকেই সমস্ত জীবন সাধনা করিয়াছেন, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমরা তাহারই ভিত্তি স্থাপন করিয়া চলিয়াছি।"

"কোন অর্থনৈতিক বা অন্য কোন নীতিই আমরা অনুসরণ করি না কেন, দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত না হইলে কোন সুফল পাওয়া যাইবে না। বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে কোন ভাল জিনিষের সৃষ্টি হইতে পারে না।"

"ভারতের সন্তানদের নিকট ভারতবর্ষ আজ কাজ চায়।"

"মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য খাদ্য আজ সমস্যার আকারে আমাদের নিকট দেখা দিয়াছে। অতএব আসুন, আমরা আমাদের আশু কার্যে মনোনিবেশ করি।"

স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবস। ভারত ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। আজ হইতে দুই বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রক্ষমতা এই দিন-টিতেই বৃটিশের হাত হইতে ভারতবাসীর হাতে আসিয়া পড়ে।

বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য ভারতবাসী দীর্ঘ সাধনা করিয়াছে। সেই সাধনার ইতিহাসে আমরা কংগ্রেসের কর্মনীতির ক্রম-বিকাশ দেখিতে পাই—দেখিতে পাই আবেদন—নিবেদন—সমা-লোচনা—অভাব অভিযোগ ও বিভিন্ন দাবী কেমন করিয়া মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ক্রমে সংগ্রাম মুখী গণ-আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্য ভারতের বিপ্লবী কর্মীদের প্রয়াস আমরা দেখিয়াছি; দেখিয়াছি, বৃটিশ শাসন শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী দলের সশস্ত্র আঘাত হানিবার মৃত্যুঞ্জয় সঙ্কল্প। স্বাধীনতার জন্য দেশভক্তদের ত্যাগ-তপস্যা, নির্যাতন ভোগ আমরা দেখিয়াছি কত অমূল্য জীবনের বলি দেখিয়াছি।

কংগ্রেস যেদিন লাহোরে স্বাধীনতার সঙ্কল্প গ্রহণ করে সেদিনটিকে আমরা স্মরণ করিয়াছি—সঙ্কল্পকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য—সঙ্কল্পসিদ্ধির পাথেয় সংগ্রহের জন্য। পরাধীন ভারতের স্বাধীনতা সঙ্কল্পের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল জাতির অন্তরে পরাধীনতার জ্বালা ধরাইয়া দেওয়া। ভারতবাসী বিদেশী শাসনের অমর্যাদাকে যাহাতে মানিয়া না লয়—ইহার অবসানের জন্য সর্বদুঃখ বরণে প্রস্তুত হয়—তাহাই ছিল পরাধীন

ভারতের স্বাধীনতা সঙ্কল্পের বড় কথা। মহাত্মাজী এক অভিনব পথে জাতির গণশক্তিকে জাগ্রত ও উদ্যত করিয়া তোলেন। বৃটিশ শাসন শক্তিকে ক্ষমতা ত্যাগ করিবার সকল সুযোগ ও সুপরামর্শ দান করিয়াও যখন তিনি ব্যর্থ হইলেন তখন ১৯৪২ সালের ৯ই আগস্ট—তিনি বৃটিশ শক্তিকে নির্দেশ দিলেন "ভারত ছাড়"। "ভারত ছাড়" এই দাবী জাতীয় দাবীর আকারে সমগ্র ভারতে স্বতঃস্ফুর্ত আকারে দেখা দিল। নিরস্ত্র ভারতের এই গণ-অভ্যুত্থান পৃথিবীর স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। একদিকে যুদ্ধ, ভারতব্যাপী গণ-বিক্ষোভ, নেতাজীর সশস্ত্র মনিপুর অভিযান—নৌবিদ্রোহ বৃটিশ-সিংহকে ভারত ত্যাগের একমাত্র পন্থা গ্রহণে বাধ্য করিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র গঠিত হইল। কিন্তু ভারত অখণ্ড থাকিতে পারিল না। সাম্প্রদায়িকতার উগ্র তাণ্ডব ভারত বিভাগের ভিত্তিতে দুই স্বাধীন রাষ্ট্র পত্তনে কেন নেতৃবর্গ সম্মত হইলেন—তাহার আলোচনা আজ বৃথা। বিভাগের বেদনা, বিভাগের দুঃখ যে কত গভীর, তাহা আমরা জানি। অপরিহার্য সেই ব্যবস্থাকে কেন মানিতে হইল তাহাও আমরা জানি। এই দেশ-বিভাগ হেতু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দ যে সমগ্র জাতি উপভোগ করিতে পারে না, পারে নাই—তাহাও কাহারো অজ্ঞাত নহে।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, ইহা বাস্তব ও প্রত্যক্ষ সত্য। স্বাধীনতা আসলে কি বস্তু, তাহা আমাদের জানিতে হইবে। স্বাধীনতা আসলে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার। আমাদের দেশশাসন ও সংরক্ষণের ষোল আনা দায় ও দায়িত্ব আমাদেরই করায়ত্ত। আমাদের বাঁচা মরা—ভালমন্দ আমাদেরই হাতে। সেই অধিকার আমরা কিভাবে প্রয়োগ করি—তাহারই উপর আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। পৃথিবীর স্বাধীন জাতিগুলির সকলেই এক স্তরে থাকে না, এক স্তরে নাই। কোন কোন স্বাধীন জাতি রাষ্ট্র সমাজে শিক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্পে অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থায় উন্নতির শিখরে উঠিয়াছে, কোন কোন স্বাধীন জাতি স্বাধীনতা সত্বেও

দুর্বল; শিক্ষায়, শিল্পে অর্থনীতি ও সমাজ জীবনে, শাসনব্যবস্থার জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুন্নত। স্পষ্টতঃই দেখা যায় স্বাধীনতাকে যেমন করিয়া জীবনে—জাতি সংগঠনের কাজে লাগানো যায় বা যাইতো —তাহা এই সকল দেশে সম্ভব হয় নাই।

আমরা স্বাধীনতার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিলাম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে—জাতি সংগঠনের তথা স্বাধীনতাকে জাতির জীবনের সর্বস্তরে রূপায়িত করিবার যে সুযোগ সুবিধা আমাদের আসিয়াছে বিগত দুই বৎসরে সেই সুযোগ আমরা কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছি —কতটা গ্রহণ করিতে পারি নাই—আজ স্বাধীনতা দিবসে অবশ্যই আমাদের তাহা বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। সেই বিচার বিশ্লেষণ করিতে বসিলেই আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের কর্তব্য পালিত হইবে।

একটা দেশ স্বাধীনতা লাভ করিলেই তাহার সর্ব কামনার সিদ্ধি ঘটে না; তাহার সকল সমস্যার অবসান ঘটে না। আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ রাষ্ট্রতরণীখানা প্রশান্ত সলিলে নির্বিবাদে বহিয়া যাইতে পারিয়াছেন—তাহা নহে। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতার বিপদগুলিও মাথা চাড়া দিয়া উঠে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের কতগুলি গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সাম্প্রদায়িক অনৈক্য, অস্পৃশ্যতা-সমস্যা, স্পৃশ্যে-অস্পৃশ্যে ভেদ দেশীয় রাষ্ট্র-গুলির স্বাতন্ত্র্যবোধ বলা বাহুল্য এই তিনটিই একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের হেতু হইতে যথেষ্ট। দুই বৎসরের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা বিরোধী উপরোক্ত তিনটি গুরুতর সমস্যারই পর্যাপ্ত সমাধান আমরা করিতে পারিয়াছি। সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ও তজ্জনিত বাস্তুহারা সমস্যা—দেশীয় রাষ্ট্রগুলির বিপজ্জনক অস্তিত্ব—ভারত রাষ্ট্রকে সামান্য বিব্রত করে নাই। আজ দেশের অর্থনীতিক জীবন গঠনের—দেশের ব্যাপক দারিদ্র্য মোচনের গুরুতর কর্তব্য সম্মুখে বিদ্যমান। এই সমস্যাও যে কোন স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেই বিপজ্জনক। এই সমস্যার সমাধানকল্পে রাষ্ট্রের ও জাতির সমগ্র শক্তিকে এই তৃতীয় বৎসরে

সক্রিয় করিয়া তুলিতে লইবে। স্বাধীনতাকে ভারতের জনগণের কল্যাণে রূপান্তরিত করিবার প্রয়োজনই আজ একান্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার সুযোগ যেমন আমাদের কাম্য—স্বাধীনতার দায়-দায়িত্ব গ্রহণের চারিত্রিক নিষ্ঠাও তেমনি কাম্য।

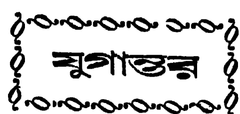
স্বাধীনতা লাভ করিলে আমাদের দুঃখের অবসান হইবে, আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহা জাতি শুনিয়াছিল—আমরাই নিয়ত শুনাইয়া আসিয়াছি। আজ যে কোন দুঃখ অভাবের জন্যই জনসাধারণ স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হইবে, বলিবে স্বাধীনতা পাইলাম তো—দ্রব্যমূল্য আমাদের ক্রয় শক্তির ঊর্দ্ধে কেন, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা তীব্র কেন? এই ক্ষোভ দূর করিতে হইলে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতি প্রয়োজন, তেমনি জনগণের অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলির সহজ প্রাপ্তি ও উৎপাদনের সুব্যবস্থার প্রয়োজন। এই বিষয়ে গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা সুষ্ঠু ও নির্দোষ হইলেই হইবে না। পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিবার আন্তরিকতা, শ্রমনিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, যোগ্যতা, আদর্শনিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন। ইহাও অতি সত্য, কোন পরিকল্পনা যত উৎকৃষ্টই হউক তাহার সাফল্য জনগণের সাগ্রহ সহযোগিতার স্পর্শ ভিন্ন সম্ভব হইতে পারে না।

কংগ্রেস ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সক্ষম জন-প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতাকে জাতির জীবনের সর্বস্তরে কার্যকরী করিয়া তুলিতে কংগ্রেস কর্মীর আদর্শনিষ্ঠা ও উদ্যমের প্রয়োজন। কংগ্রেস আবার আজ জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হউক। কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানকে কেবল স্থির হইয়া থাকিলেই চলে না। ইহা অতি সত্য, কংগ্রেসের সর্বভারতের সম্মানের ও শ্রদ্ধার নেতৃবর্গ আজিও জনগণের শ্রদ্ধা লাভ করিতেছেন। ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তাঁহাদের কর্মনিষ্ঠা, ত্যাগ ও চরিত্র জনগণের বিশ্বাসের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার যে, নূতন নূতন কর্মিকুলের আবির্ভাবের দ্বারা কংগ্রেস আশানুরূপ শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিতেছে না। অথচ ভারতের স্বাধীনতাকে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক

সমুন্নতির জন্য সম্যক কাজে লাগাইবার পক্ষে কংগ্রেসের গণ-সংযোগেরই উপযোগিতা সর্বাধিক। সেই জন্যই চাই নূতন নূতন কর্মীর আবির্ভাব। কংগ্রেসকেই গণপ্রতিষ্ঠান রূপে সক্রিয় হইতে হইবে। কংগ্রেসের এই রূপান্তরেই স্বাধীন ভারতকে মহাত্মাজীর অভীষ্ট মহাভারতে পরিণত করিতে পারিবে। স্বাধীনতা দিবসটিতে স্বাধীনতার তাৎপর্য—স্বাধীনতার দায়িত্ব ও কর্তব্য—স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আমরা কি করিতে পারিয়াছি, কি করিতে পারি নাই তাহারই জন্য সক্রিয় হইবার সঙ্কল্প গ্রহণ কবিতে হইবে।

কোন কোন বামপন্থী দল এই স্বাধীনতা দিবসটির 'প্রতিবাদ' করিবার জন্য অতি মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন দেখিতেছি। এই স্বাধীনতাই নাকি ভূয়া স্বাধীনতা। পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন জাতির মতই কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পাইয়াছি। আমাদের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য ইংরেজ বড়লাট নাই, গবর্ণর নাই, ইংরেজ সেনাপতি নাই। আমাদের বৈদেশিক নীতি আমরাই নির্ধারণ করিতে সক্ষম। আমাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কর্তৃত্ব আমাদেরই হাতে। আমাদের অর্থনীতি আমরা স্থির করি। ব্রহ্ম-ইন্দোনেশিয়া আজ ভারতের সাহায্যকামী কি এই ভূয়া স্বাধীনতার জন্য? আজ বৃটেন-রাশিয়া-যুক্তরাজ্য ভারতকে বন্ধুরূপে পাইতে কামনা করে (অবশ্য নিজ নিজ স্বার্থেরই জন্য) সে কি ভারতের স্বাধীনতা অবাস্তব বলিয়া? স্বাধীনতা পাওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা সমগ্র জাতির জীবনে এখনও সক্রিয় হইয়া উঠে নাই, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু সে তো স্বাধীনতার দোষ নয়। তাহা অন্য নানা কারণ ঘটিতে পারে, তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহারা ভূয়া স্বাধীনতা প্রমাণ করিয়াই কর্তব্য পালন করিতে চাহেন, তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনে, নিজেদের দল গঠনে, নিজেদের কোন রাজনৈতিক আদর্শ থাকিলে, তাহা জীবনে কতটুকু সফল করিতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের অযোগ্যতা অক্ষমতা এবং জানা অজানা অসুবিধার জন্য ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাদের জীবনই ভূয়া হইয়া গিয়াছে? তাঁহাদেরও জীবন

আছে, জীবনের সুযোগ তাঁহাদেরও আছে, তাহার সম্যক সদ্ব্যবহার তাঁহারা করিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহাদের জীবনটাই ঝুটা বলা চলিবে কি? একটু স্থির হইয়া একটু নূতন কিছু বলিবার জন্য দলীয় অতি ব্যগ্রতা ত্যাগ করিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারি—ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বাস্তব সত্য। সেই স্বাধীনতার সুযোগ যাহাতে সমগ্র জাতি লাভ করিতে পারে, স্বাধীনতাকে জাতি সংগঠনের কাজে লাগানো যাইতে পারে, স্বাধীনতা দিবসে তাহারই জন্য নূতন প্রেরণা লাভ করিতে হইবে।



দ্বিতীয় বার্ষিকী

পৃথিবীর আধুনিক ইতিহাসের বিচারে ভারতবর্ষ কনিষ্ঠতম স্বাধীন দেশ, যদিও অন্যান্য বহুদিক বিবেচনা করিলে সে বৃহত্তমের পর্যায়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন হইতে পূর্ণ মুক্তি পাইয়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের দুই বৎসর অতিক্রম করিয়া আজ তৃতীয়-বর্ষে পদার্পণ করিল। বার্ষিক হিসাবে ইহা দ্বিতীয় উৎসব—যখন অন্যান্য দেশ বহু যুগ পূর্বে শত বার্ষিকী উৎসব পিছনে ফেলিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পাঠান, মোগল ও বৃটিশ যুগের পর ভারতবর্ষ যে নূতন স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, উহার সাম্যক রূপ এখনও আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। প্রায় দুইশত বৎসরের বৃটিশ রাজত্বের পর সেই রূপ মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে উপলব্ধি করা সহজ নহে, এবং বোধ হয় সম্ভবও নহে। কারণ বর্ত্তমান যুগে

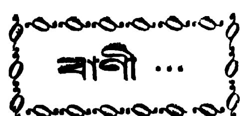
স্বাধীনতার স্বরূপ বদলাইছে, কেবলমাত্র উচ্ছ্বাসময় জাতীয়তার ভাবাবেগ এবং বিশুদ্ধ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাই যে যথেষ্ট নহে, এই চেতনা জনসাধারণের চিত্তে ব্যাপকরূপে দেখা দিতেছে। বর্ত্তমানে স্বাধীনতার সঙ্গে একটা বৈপ্লবিক আদর্শ জড়াইয়া পড়িয়াছে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে এতদিন ধরিয়া পুরাতন যাহা কিছু ছিল, উহার সমস্তেরই আমূল পরিবর্তন সচেতন জনসমাজ প্রত্যাশা করিতেছে। বৃটিশ রাজত্বের অবসান এবং ভারতীয় জনগণের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা আসার পর দেশের চেহারা একরাত্রির মধ্যে বদলাইয়া যাইবে, এমন একটা অস্পষ্ট ধারণা ও স্বপ্ন জনসাধারণের মন আচ্ছন্ন করিয়াছিল, কিন্তু বিগত দুই বৎসরে দেখা গেল যে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় এবং সমাজের সমষ্টিগত বিকাশধারায় নূতন কিছু পরিবর্তন ঘটে নাই, বরং দুঃখ কষ্ট, অভাব ও দারিদ্র্য বৃটিশ আমলের তুলনায়ও বহুদিক দিয়া বাড়িয়া গিয়াছে। অথচ যে অর্থে বৃটেন স্বাধীন, আমেরিকা স্বাধীন আমাদের স্বাধীনতা তার চেয়ে কোন দিক দিয়া ন্যুন নহে। কিন্তু জাতির সমষ্টিগত জীবনের সম্পদে এবং পার্থিব শক্তি আহরণে আমরা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির তুলনায় অনেক দূর পিছনে পড়িয়া আছি। এই সম্পদ ও শক্তি মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে গড়িয়া ওঠা সম্ভব নহে, তেমন কল্পনা করাও মুর্খতা মাত্র। তবু আমরা বোধ হয় এই ধরণের একটা কিছু প্রত্যাশা করিয়াছিলাম— যে প্রত্যাশা রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কিন্তু জনগণকে অপেক্ষা করিতে হইবে, ধৈর্য ধরিতে হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পরাধীনতার পর মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে স্বর্গ রাজ্যের রচনা হইতে পারে না, "রামরাজত্ব" দেখা দিতে পারে না। অতীতের যে দৈন্য, যে ত্রুটি, যে দুর্বলতার জন্য আমরা যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অভিশপ্ত জীবনযাপন করিয়াছি, সেই সমস্ত ত্রুটি ও গ্লানি দূর করিবার জন্য নূতন জীবনদর্শনের প্রয়োজন আছে। কেবল কংগ্রেসকে এবং গভর্ণমেণ্টকে গালাগালি করিলেই আমাদের চরিত্রের দুর্বলতার অবসান হইবে না। এ কথা মনে রাখা দরকার

যে জাতি যতটা উন্নত তার গভর্ণমেণ্ট তার চেয়ে বেশী উন্নতিশীল হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টই সেই দেশের শক্তিশালী সামাজিক উপাদানগুলির প্রতিনিধি মাত্র। সুতরাং কংগ্রেস কিম্বা কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট আমাদের জাতীয় জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র।

বহু দুঃখ, বহু দৈন্য এবং বহু লাঞ্ছনা সত্ত্বেও গত দুই বৎসরে ভারতবর্ষ একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, একদিকে যেমন ভারতবর্ষের পাকিস্থানী অংশ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ধীরে ধীরে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে। স্বাতন্ত্র্যবিলাসী প্রদেশগুলি কেন্দ্রের দিকে এবং কৃত্রিম স্বাধীনতার দাবীদার দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতভূমির দিকে ধাবমান হইতেছে, কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন একটি নূতন ভারতবর্ষ অখণ্ড রূপ লইয়া দেখা দিতেছে—যে রূপের সন্ধান অতীত ইতিহাসে পাওয়া কঠিন। নিঃসন্দেহে ইহার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল জাতীয় কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের পতাকাতলে বাঙ্গালী, বিহারী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ছত্রিশ জাতি যেমন একতাবদ্ধ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছে, তেমনই হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট হইতে ব্রহ্ম সীমান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারী হাতে হাত দিয়া স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করিয়াছে। নিরক্ষর গ্রামবাসী ও চাষী পর্যন্ত যে চেতনা কংগ্রেসের দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া প্রসারিত হইয়াছে, তাহা যেমন আমাদের নূতনতর জাতীয় জীবণের এক পরম বিস্ময়। তেমনই এই বিস্ময়ের গৌরব যদি কোন একক ব্যক্তি দাবী করিতে পারেন, তবে, তিনি হইতেছেন জাতির জনক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী। কোন দেশের রাষ্ট্রজীবনে এতবড় মানুষ বর্তমান শতাব্দীতে আর আবির্ভূত হয় নাই। আজিকার স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে আমরা সর্বাগ্রে সেই লোকোত্তর মহামানবকে যেমন শ্রদ্ধানতচিত্রে স্মরণ করিব, তেমনই কংগ্রেসী প্রধানগণের সঙ্গে অগণিত শহীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেও প্রণাম জানাইব। আর এই প্রার্থনা করিব যেন নূতন

ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়, মনুষ্যত্বের অধিকারে এবং মূক জনসাধারণের নূতন মুক্তির আনন্দে গৌরবান্বিত হইতে পারে। স্বাধীন ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক জগতে সৌভ্রাত্র ও প্রেম, অহিংসা ও শান্তির পতাকাবাহী হইবে—শোষণ, বঞ্চনা ও যুদ্ধকে পরিহার করিয়া ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যেন নিখিল মানবের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নূতন ইতিহাস রচনা করিতে পারে। আসুন, এই প্রতিজ্ঞা ও এই সঙ্কল্প আমরা আজ গ্রহণ করি। জয় হিন্দ!



আমার মত এই যে ভারতবর্ষের বুকের উপর যত কিছু দুঃখ আজ অভ্রভেদী জুরে দাঁড়িয়ে আছে তার একটি মাত্র ভিত্তি হচ্ছে অশিক্ষা। জাতিভেদ, ধর্ম বিরোধ, কর্মজড়তা, আর্থিক দৌবল্য—সমস্তই আঁকড়ে আছে এই শিক্ষার অভাবকে।

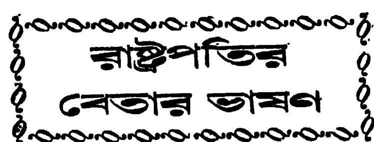
১৯৫০

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী শ্রীঅরবিন্দ

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি



রাষ্ট্রের সাহায্যকল্পে সর্বশক্তি নিয়োগের আহ্বান

ভারতের স্বাধীনতা লাভের তৃতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ জাতির উদ্দেশে বলেন, "রাষ্ট্র যাহাতে সুষ্ঠুভাবে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেজন্য জাতিকে তাহার সমস্ত সম্পদ ও ইচ্ছাশক্তি লইয়া রাষ্ট্রের সহায়তা করিতে হইবে।"

তিনি বলেন, "কেবল মাত্র ন্যায়ের পথে অবিচল থাকিয়া এবং যে কোন বিষয়ের নৈতিক দিকের প্রতি সত্য দৃষ্টি রাখিয়া আমাদের জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে। আমাদের দেশবাসী মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী, তাহাদের মধ্যে প্রভূত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি বিদ্যমান। তাহারা আভ্যন্তরীণ রিপুকে জয় করিয়া গৌরবময় ভারতকে গড়িয়া তুলিতে পারিবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসংশয়।"

তিনি আরও বলেন, "যে দেশ নিজের খাদ্যের সংস্থান নিজে করিতে না পারে, সেই দেশ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভের আকাঙ্খা করিতে পারে না।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রত্যেক নরনারীকে দায়িত্ব পালন করিতে অনুরোধ

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—স্বাধীনতা অর্জনের তৃতীয় বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অদ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন কালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেন, "যদি আমরা আমাদের মন হইতে ভয় ও দুর্বলতা দূর করিতে পারি, তাহা হইলে ভিতরের ও বাহিরের কোনও বিপদেই আমাদিগকে অভিভূত হইতে হইবে না।"

তিনি বলেন," দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা প্রত্যেক ভারতবাসীর প্রথম কর্তব্য। কিন্তু তাহা হইলেও এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা স্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিতে ব্যগ্র। ইহা অদ্ভূত ও জাতীয়তা-বিরোধী মনোভাব।"

তিনি আরও বলেন, "অতীতে দেশ বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। জনসাধারণের শক্তি এবং নীতিতে অটল বিশ্বাস বলেই সে সকল পরীক্ষায় দেশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে দেশ সেইভাবে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে।"

—ইউ, পি, আই।

আনন্দ বাজার পত্রিকা

স্বাধীনতা দিবস

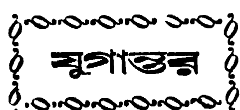
"সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন
আসিবে সেদিন আসিবে !"

যে বহু আকাঙ্খিত দিনটিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার নিশ্চিত আগমন সম্ভাবনা সম্বন্ধে কবি এই আশা ও আশ্বাসের বাণী শুনাইয়াছিলেন, যাহার শুভাগমন সম্ভাবনাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কবি তাঁহার কল্পবীণায় এই সম্বর্ধনা সঙ্গীত ধ্বনিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই চিরবাঞ্ছিত দিন সত্য সত্যই আসিল এবং আসিল পরাধীন জাতির জীবন নিশার আঁধার নিকষে নূতন জীবন উষার কনকরশ্মি বিকীরণ করিয়া বনে বনে নিদ্রিত বিহঙ্গনীড় নব জাগরণের আনন্দ কাকলী জাগাইয়া দিয়া সোনার জীয়ন কাঠির স্পর্শে সুষুপ্ত নরনারীর তন্দ্রাঘোর ভাঙ্গিয়া দিয়া, কবির জীবন-স্বপ্নের চরম সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, লক্ষ কোটি অন্তরের অব্যক্ত ব্যাকুল বাসনার পরিপূর্ণ চরিতার্থ বহন করিয়া। সে দিন একদা আসিয়াছে এবং কালচক্রের আবর্তনবেগের বিঘুর্ণিত হইয়া বর্ষ পঞ্জির পৃষ্ঠায় বারবার সে আসিবে। সদ্যোত্থিত ভারতবাসী। আজিকার এই প্রভাত আলোকে প্রথম নয়ন মেলিয়া বুঝিতে পারিতেছি নাকি যে বরণীয় এবং স্মরণীয় সে দিনটি আজ আবার ভারতের শ্রাবণ আকাশে সমাগত। তাহারই অভিনন্দনের জন্য দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে কোটি কণ্ঠে সহর্ষ

উলুধ্বনি, শঙ্খে শঙ্খে উদাত্ত মঙ্গলগান, প্রভাতফেরী দলের মিলিত কণ্ঠে সানন্দ সম্বর্ধনা সঙ্গীত। অশোকচক্র-লাঞ্ছিত জাতীয় পতাকার আন্দোলন শব্দে শুনিতে পাও নাকি, নবজাত জাতির দ্রুতছন্দ হৃৎস্পন্দন ; কুচকওয়াজরত সেনাদলের পদক্ষেপের ঐক্যতান ধ্বনিতে শুনিতে পাও নাকি জাতীয় ঐক্যের সুগম্ভীর ঋকমন্ত্র! দেখিতে পাও নাকি, ভারতের গৌরবময় অতীত ঐতিহ্য অশোকচক্রের পরিধি প্রান্তে দাঁড়াইয়া সশ্রদ্ধ স্নেহে অপর প্রান্তস্থ ভারতের সুবিপুল ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কর ধারণ করিয়াছে। আর বর্তমান বিশ্ব ত্রিকাল ধারার পবিত্র সঙ্গম তীর্থে দাঁড়াইয়া সুমহান সমন্বয় লীলা!

কবির কল্প-জগতের সেদিন, জনসাধারণের জীবন স্বপ্নের সেদিন আসিয়াছে। কিন্তু অবিমিশ্র আশীর্বাদরূপে নয় ; সে আসিয়াছে, বহু শতাব্দীব্যাপী পরাধীনতার অনিবার্য অভিশাপ বহন করিয়া, মুমুক্ষ জাতির অনুপেক্ষণীয় দাবীর সম্মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী ভারতীয় উপকূল ত্যাগ করিল, কিন্তু বিদায়োন্মুখ শাসকশক্তি যাইবার পূর্বে অখণ্ড ভারতের অঙ্গে যে নিদারুণ অস্ত্রাঘাত হানিয়া গেল—তজ্জনিত শোণিতস্রাবে পঞ্চনদ রঞ্জিত করিয়া পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্রের সলিল রাশি রক্তাক্ত করিল। তাহার পর শুরু হইল, লক্ষ লক্ষ আশাহীন ও আশ্রয়হীন নরনারীর নিরুদ্দেশ শোভাযাত্রা ; সে যাত্রার আজও বিরাম নাই, বিরতি নাই ; কে বলিবে অন্তহীন এই শোভাযাত্রার সমাপ্তি করে এবং কোনখানে! অথচ জাতিয় মুক্তি ইহারাও সমস্ত অন্তর দিয়া কামনা করিয়াছিল, জাতির মুক্তি সাধনায় ইহাদেরও অংশ অবদান ছিল। সে স্বাধীনতা আসিল এবং আজ পনেরই আগস্ট তাহারই স্মরণীয় দিন ; শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে পড়িয়া যাহারা যাযাবর জীবন যাপন করিতেছে, নগরীর মহোৎসব তাহারা কি দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবে। আশ্রয় শিবিরে যাহারা সাময়িক আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, জাতীয় উৎসব তাহারা কি ভাবে পালন করিবে আজিকার উৎসবের আলোকোজ্জ্বল অঙ্গণে বিষাদ যদি বেদনার বেহাগ মিশ্রণে করুণ ও

বিধুর হইয়া উঠে—তথাপি আলোছায়ায় ধূসর এই দিনটিকে পরম সমাদরের সহিত আমরা বরণ করিয়া লইবই। জাতীয় জীবন মন্থনে যদি গরল এবং অমৃত উভয়ই উত্থিত হইয়া থাকে সেক্ষেত্রে একটিকে বরণ করিয়া অপরটি বর্জন করিলে চলিবে না; উৎসব আমাদের জীবনে যতখানি সত্য, ব্যসনের বাস্তবতা তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নয় এবং উভয়ের সমবায়ে যে জীবন—তাহাই আমাদের জাতীয় সত্তার বর্তমান স্বরূপ। স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সে স্বরূপ কেবলমাত্র বর্তমানের, চিরদিনের নয় এবং স্বাধীনতার স্পর্শমণি যে জাতির করায়ত্ত, বর্তমানের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রকে ভবিষ্যতের কুসুমাস্তীর্ণ কাননে রূপান্তরিত করা তাহার সাধ্যাতীত নয়; তাহা শুধু সাধন ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার মাত্র। যে দুর্জয় সাহস ও দুর্নিবার শক্তি পর-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য আমাদের প্রেরণা দিয়াছিল, আজ স্বাধীনতা দিবসের দাক্ষিণ্যের নিকট হইতে তাহাই আমাদিগকে আবার যাচ্ঞা করিয়া লইতে হইবে এবং যাচিত সেই আশীর্বাদ যুগলই হইবে আমাদের বর্তমান জীবন সংগ্রামের সহায় ও ভবিষ্যৎ জীবন পথের সম্বল। স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইয়াছে। অর্জিত স্বাধীনতা জাতির জীবনে সত্য হোক, সার্থক হোক, কল্যাণপ্রসূ হোক! বন্দে মাতরম্!



পনেরই আগস্ট

বৈদেশিক শাসন অবসানের পর তিন বৎসর অতীত হইল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতীয় ইতিহাসের চির-স্মরণীয় দিন। যে কোন জাতির মুক্তিদিবস তাহার নিকট চির-রমণীয় এবং চির-

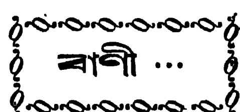
বরণীয়। যে সকল নরনারীর সুদীর্ঘকালের সাধনা, সংগ্রাম ও আত্ম-ত্যাগের ফলে ভারতের জাতীয় মুক্তির আন্দোলন সফল হইয়াছে, আজ ছোট-বড়, জ্ঞাত-অজ্ঞাত সেই সকল সেবক ও নায়কের উদ্দেশ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি, আর সেই সঙ্গে অভিবাদন জানাই আমাদের জাতীয় পতাকার প্রতি, যাহা আমাদের আশা ও আদর্শ চিরকাল উর্ধে তুলিয়া ধরিয়াছে, এই সুমহান জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহা আমাদের সাহস ও শক্তি অক্ষুন্ন রাখিয়াছে। যাঁহারা দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, তাহারা অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখিয়া অপরের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। ভারতের জাতীয় পতাকায় লেখা রহিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্থান-পতনের বিপদ ও বিপর্যয়ের ইতিহাস এবং সর্বশেষে জয়-লাভের জ্বলন্ত কাহিনী। প্রত্যেক দেশেই তাহার জাতীয় উৎসব প্রতি-বৎসর আনন্দ, আড়ম্বর ও সমারোহ সহকারে পালিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও গত তিন বৎসর ইহা যথোচিত গাম্ভীর্য ও আনন্দ সহকারেই পালিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অবস্থা বিপাকে ভারতবর্ষে এখন এমন কতকগুলি আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত দুঃখ-দুর্যোগে মানুষের দৈনন্দিন জীবন আলোড়িত হইতেছে যে, উৎসবের সময় আসিলেও মনে আনন্দের প্রেরণা আসে না; হর্ষোল্লাসের সময়েও মানবচিত্ত কেমন একটা বিষাদে অভিভূত হইয়া পড়ে। স্বাধীনতা লাভের পরে তিন বৎসর অতীত হইয়াছে, প্রথম বৎসরের ব্যাপক উন্নতি পরিকল্পনা দ্বিতীয় বৎসরে স্থগিত রাখিতে হইয়াছে। দ্বিতীয় বৎসরে খাদ্য স্বাবলম্বনের সঙ্কল্প তৃতীয় বৎসরে দুর্ভিক্ষের আসন্ন ছায়ায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। অসহায়, ক্ষুধার্ত নরনারী আমাদেরই চারিদিক ঘিরিয়া নিবেদন করিতেছে তাহাদের কাতর মিনতি। সর্বস্বান্ত, মান-প্রাণভীত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু চাহিতেছে আশা, আশ্রয় ও জীবিকার আশ্বাস। বিরাট সমস্যার বিশাল তরঙ্গাঘাতে সামাজিক ও পারিবারিক জীবন বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত। কোথায় খাদ্য, কোথায় জীবিকার্জনের পথ? চারিদিকে উচ্ছৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবার দেখা দিয়াছে কোরিয়া হইতে বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক। খাদ্য ও

বস্ত্র সমস্যার সমাধান না হইলে, সাধারণ মানুষের নিকট স্বাধীনতা অর্থহীন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট হইতে ১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত ভারতীয় নরনারী স্বাধীনতার এই প্রাথমিক রূপ বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে,—যে দিন যায় সেই দিনই সুদিন, আর যে দিন আসে সেই দিনই দুর্দিন! এমন সময় কেহ যদি আসিয়া ডাক দেয়,—ওঠো জাগো, আজ ১৫ই আগস্ট, জাতীয় মহোৎসবের দিন, তাহা হইলে তাহাতে জাগিয়া উঠিতে হয় বটে, কিন্তু মনে তো উৎসাহ না দিয়া গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠান পালনের জন্যই অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন! পনেরই আগস্ট আনন্দ উৎসবের দিনও বটে, আত্মানুসন্ধানের দিনও বটে। এই দিনের গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে বার বার একটি প্রশ্নই মনে জাগিতেছে, আমরা কোথায় চলিয়াছি? জাতির জনক হিসাবে আমরা যাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছি, আজও করিতেছি, তিনি ভারতবাসীর জন্য যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন আমরা কি তাহা পালন করিতেছি? মহাত্মা গান্ধী দরিদ্র ভারতের কথা মনে করিয়া আজীবন দীনতম ব্যক্তির প্রতীকরূপে নিজে কটিবাস ধারণ করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন, ঐশ্বর্য, আড়ম্বর, বিলাস, সমারোহ দূরে রাখিয়া তিনি সেই বেশেই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষার জন্য তিনি রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বাছিয়া লইয়াছিলেন। বাস্তবের ভিত্তিতেই মহাত্মা গান্ধী ভারতের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আজ মনে হইতেছে বাস্তবের ভিত্তিভূমি উপেক্ষা করিয়া আমরা আদর্শবাদকে উৎকট করিয়া তুলিতেছি। নিরন্ন, বুভুক্ষু নরনারীর প্রতি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদন অপেক্ষা আন্তর্জাতিকতার মোহে অধিক প্রলুব্ধ হইতেছি। মহাত্মা গান্ধীর আচরণ ভুলিয়া কথায় কথায় তাঁহার আদর্শবাদের অতিশয়োক্তি পার্লামেণ্টে বড়ই বেমানান এবং বেসুরো বাজিতেছে। নিরন্ন নরনারীর অন্ন ছাড়া আর কিসের রাজনীতি? একটি মাত্র সমস্যা সমাধানের অক্ষমতায়

যে আর সব পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইতেছে তাহা দেখিবার মতো, বুঝিবার মতো মস্তিষ্কের কি সত্যই অভাব ঘটিল ?

পনেরই আগস্ট দেশ স্বরাজ লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের হয়তো এখনো অনেক বাকী। স্বাধীনতায় দেশের শাসক ও শাসিতের উভয়েরই সে কর্তব্য আছে, আমাদের অনেকেই তাহা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। যাঁহারা শাসকগণের সমালোচনায় পঞ্চমুখ, তাঁহারা তাহাদের নিজ কর্তব্য পালনে উদাসীন। সরকারকে সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দায়ী করা হইয়া থাকে; কিন্তু জনসাধারণের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের হিসাব কেহ দিতে প্রস্তুত নহেন। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের ভাগ্য ও ভাগ্য দেবতাগণ এক পাপচক্রে আবর্তিত হইতেছে। তথাপি এই অস্বস্তি-কর অবস্থার মধ্যে হয়তো একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, জগতের কোন দেশই স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে আত্ম-সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয় নাই। প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা লাভের পরে কিছুকাল নানা বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলায় কাটিয়াছে। জাতির জয়যাত্রার পথে তিন বৎসর খুব বেশী সময় নহে। সম্মুখে যে সুদীর্ঘ কাল ও সুবিস্তৃত পথ প্রসারিত রহিয়াছে, অতীতের দুঃখ গ্লানি, বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি তাহাকে কর্ম গৌরবে দীপ্ত করিয়া তুলিতে পারি, ব্যক্তিগত কর্তব্য ও জাতিগত দায়িত্ব সম্পর্কে সম্যক সচেতন থাকিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে সচেষ্ট হইতে পারি, তাহা হইলেই জাতীয় জীবনে সমৃদ্ধি ও সার্থকতা আসিবে। ১৫ই আগস্টের স্মৃতি উৎসব ভারতবাসীর জীবনে সেই বাণীই বহন করিয়া আনিয়াছে। কে কি করিয়াছে না করিয়াছে, তাহার আলোচনা অপেক্ষা কে কি করিয়াছি ও করিতেছি, তাহাই যেন আমাদের জীবনে প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া উঠে। আমাদের সমস্যাগুলি গুরুত্বপূর্ণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বহু কণ্টকাস্তীর্ণ সন্দেহ নাই, তথাপি তেত্রিশ কোটি নরনারীর সম্মিলিত শক্তি যেখানে

সংঘবদ্ধ, সেখানে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বাধা—বিপদই আমরা নিজ শক্তিবলে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। দুঃখ-দুর্দশার অন্ধকার হইতেই শক্তি ও সমৃদ্ধির আলো উৎসারিত হইবে। জয়হিন্দ্! বন্দেমাতরম্!



অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, কতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, বন, পর্বত, নদী বলিয়া জানে; আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মা'র বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়াইয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার কাছে আছে, শারীরিক বল নয়, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, জ্ঞানের বল। ক্ষাত্র-তেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে। সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীঅরবিন্দ

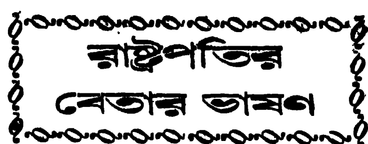
১৯৫১

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী চিত্তরঞ্জন দাস

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।



নরনারী নির্বিশেষে ভারত মাতার প্রত্যেক সন্তানকে কর্তব্য সম্পাদনের আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট :—রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রচার করিয়াছেন :-

"অপরের সৃস্ট উত্তেজনা-পূর্ণ পরিস্থিতির অধিকতর অবনতিকর সর্ব প্রযত্নে এড়াইয়া যাইবার জন্য আমরা আমাদের ঘোষিত চিরন্তন লক্ষ্য ও নীতির অনুবর্তী হইয়া যথাসাধ্য যত্নপর আছি, কিন্তু অবস্থার যদি চরম অবনতি ঘটে তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার অনুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, ভারতমাতা তাঁহার সন্তানের নিকট হইতে যে কর্তব্য সম্পাদন প্রত্যাশা করেন, নরনারী নির্বিশেষে ভারতের সন্তান সে কর্তব্য সম্পাদন করিবে।"

ইউ, পি,

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতিতে দুঃখ প্রকাশ ঃ ভারতের যুদ্ধ পরিহারের আদর্শ বিশ্লেষণ

দিল্লী, ১৫ই আগস্ট,—ভারতের স্বাধীনতার চতুর্থ বার্ষিকী উৎযাপন উপলক্ষে, দিল্লীর ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালকেল্লার প্রাকার চূড়ায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া দেশবাসীকে দেশের দারিদ্র্য, বেকার, ব্যাধি ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়ী হইবার জন্য স্থির সঙ্কল্প, সমবেত শক্তি ও আত্মবিশ্বাস লইয়া কর্তব্য পালনের সঙ্কল্প গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এবং উহার উন্নতি হইবেই, এ আমার স্থির বিশ্বাস।"

তিনি বলেন, "ভারতের নেতৃবৃন্দের পূর্ণ মতৈক্যেই পাকিস্তান গঠিত হয়। দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ যতই অনুশোচনার বিষয় হউক না কেন, দেশের স্বাধীনতার মহান স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উহা করা হইয়াছিল; পাকিস্তান গঠন এক্ষণে রদ করা যাইতে পারে না।"

পি, টি, আই

স্বাধীনতা দিবস

পনরই আগস্ট আমাদের পরাধীন জাতীয় জীবনের দুর্যোগময়ী অমারাত্রির বাঞ্ছিত অবসান, জাতীয় মুক্তি চেতনায় পবিত্র ব্রাহ্ম-মুহূর্ত, জাতীয় নবজাগরণের প্রথম উদয় ঊষা। তাই তাহারই স্বাগত সম্বর্ধনায় আসমুদ্র-হিমাচল আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতিটি ভবন-শীর্ষে প্রভাত পবনে আন্দোলিত জাতীয় কেতনের পত্ পত্ শব্দে বাজিয়া উঠিয়াছে তাহারই চরণপাতের ধীর-গম্ভীর শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে তাহারই মাঙ্গলিক, বিমান বহর সবেগে মৃত্তিকাভিমুখী হইয়া শূন্য হইতে তাহারই উদ্দেশে নিবেদন করিতেছে সশ্রদ্ধ অভিবাদন, কামান নির্ঘোষে গর্জিয়া উঠিয়াছে তাহারই কণ্ঠ নিঃসৃত মাভৈঃ বাণী, সে নির্ঘোষ কন্যাকুমারী হইতে সমুত্থিত হইয়া প্রহত হইতেছে কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রাচীর গাত্রে।

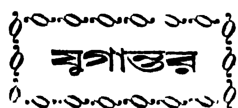
স্বাধীনতা এক হাতে যেমন পর শাসনের পীড়ন ও লাঞ্ছনার বোঝা অপসারিত করিয়া জাতীয় জীবনের দুর্বহ ভার লাঘব করে, অপর হাতে তেমনি জাতির স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের গুরুদায়িত্বপূর্ণ এমন এক বোঝা—যাহার সাফল্যমণ্ডিত উদ্‌যাপনের উপর স্বাধীনতার স্বত্ব ও সংজ্ঞা, অর্থ ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভরশীল। স্বাধীনতা দিবস সে দায়িত্বের স্মারকলিপি হাতে লইয়া নিদ্রিত জাতির শিয়রে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়; প্রতিশ্রুত জাতীয় ঋণের যতদিন না পরিশোধ হয়, ততদিন প্রতি বৎসর

নির্দিষ্ট দিনে অপ্রতিপালিত প্রতিজ্ঞাপত্র হাতে লইয়া ঠিক তেমনি করিয়াই জাতির সম্মুখে সে আসিয়া দাঁড়াইবে—উত্তমরূপে বিশ্বামিত্র ঋষি যেমন করিয়া ঋণবদ্ধ হরিশ্চন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেন। অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনার আয়োজন আমাদিগকে অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই উৎসবে মত্ত হইয়া অপূর্ণ অঙ্গীকার পত্রের প্রতি উদাসীন হওয়া চলিবে না, সূক্ষ্ম হিসাব নিকাশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে—জাতীয় ঋণের কতটা অংশ পরিশোধ করা হইয়াছে এবং কতটাই বা অবশ্য পূরণীয় দায় ও দায়িত্ব রূপে দলিলের পৃষ্ঠায় আজও বিদ্যমান।

স্বাধীনতা জাতীয় প্রতিশ্রুতির স্মারক পত্র লইয়া আসে সত্য কিন্তু তাই বলিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর হ্রাসপ্রাপ্ত মূল্য-মানের তালিকা লইয়া আসে না। সে এক হাতে যেমন জাতির স্কন্ধে চাপাইয়া দেয় তাহার চির আকাঙ্খিত আত্মনিয়ন্ত্রণের দুর্বহ দায়ভার অপর হাতে সে তেমনি আবার সদ্যঃ পর শাসন মুক্ত জাতির অসাড় ও দুর্বল দেহে সঞ্চারিত করিয়া দেয় এমন এক অদম্য প্রাণ-শক্তি—যাহার সঞ্জীবনী স্পর্শে মুহূর্তমধ্যে সংঘটিত হয় তাহার সত্তার সমূহ পরিবর্তন, ফলে তাহার পূর্ব রাত্রির খর্ব ও ক্ষুদ্র আকার রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে দায়িত্বের উপযোগী উচ্চতা লাভ করে এবং গৃহপালিত ভারাক্রান্ত জীবের ক্লান্ত পায়ে সহসা জাগিয়া উঠে শৃঙ্খল-মুক্ত স্রোতস্বিনীর দুর্বার গতিচ্ছন্দ, সে বেগ হইতে সে অর্জন করে—ছয়মাসের পথ ছয়দিনে অতিক্রম করিবার সামর্থ ও স্বাচ্ছন্দ্য। আমা-দের জাতীয় অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছে একথা বলিলে সত্যের অপলাপ হইবে, বরঞ্চ তাহার নিতান্ত প্রাথমিক সর্ত-গুলিই অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতিপালিত। তথাপি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, জটিল জাতীয় সমস্যাগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য দিকে দিকে তাহার ব্যগ্র বাহু প্রসারণ, স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় দুরূহ বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিবার জন্য দৃঢ় ও দ্রুত পদবিক্ষেপের ধ্রুব ধ্বনি। আমাদের জাতীয় জীবনের অগ্রগতির পথে আজ আর এক

সঙ্কট মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছেঃ বন্ধুভাবাপন্নপ্র তিবেশী রাষ্ট্ররূপে যে পাকিস্তান নবজাগ্রত এশিয়ার জয়যাত্রা পথে ভারতেরও সহযাত্রী হইতে পারিত---দুষ্পূরণীয় এক দুরাকাঙ্খার বশে সে যে শুধু এশিয়ার অগ্রগামী জাতি সমুহের শোভাযাত্রা হইতে নিঃশব্দে সরিয়া দাঁড়াইতেই মনস্থ করিয়াছে তাহা নয়, ভারতের অগ্রগতি ব্যাহত করিয়া শোভাযাত্রীদলের সম্মিলিত গতিছন্দের ছেদ ও পতন ঘটাইতে চাহিতেছে। তাহার পশ্চাৎ হইতে যাহারা সে কার্যে প্রেরণা ও প্ররোচনা যোগাইতেছে। এই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অদূরবর্তী ইতিহাস তাহা-দিগকে স্মরণ করিতে বলিঃ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে জাতি একদা সর্বস্ব পণ করিয়াছিল আজ অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করিবার মত সাহস ও সামর্থ, জাতিয় ঐক্য ও ঐকান্তিকতার তাহার অভাব হইবে না।

'বন্দে মাতরম্'।



পনেরই আগষ্ট

পরবশতার গ্লানি-মুক্তির চারি বৎসর অতীত হইল। ভারতের জাতীয় ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট চিরস্মরণীয় দিন। এই দিনে শুধু বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে নাই, ভারতবাসীর জীবনেও নূতন চেতনা, নব জীবনের স্পন্দন আনিয়াছে, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় যে উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং জাতিধর্ম সম্প্রদায় নির্বিবশেষে প্রগাঢ় প্রীতি ও ঐক্যের আন্তরিকতা দেখা গিয়াছিল, তাহা অভূতপূর্ব ও অবীস্মরনীয়। সেদিন সকলেরই মনে হইয়াছিল যে, এই দিন উৎসাহ যেন জাতীয় জীবনে চিরস্থায়ী হইয়া থাকে। তারপর একে একে চারি বৎসর অতীত হইয়াছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বহু সমস্যা

এক সঙ্গে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার নব অরুনোদয়ে যে সুদিনের সূচনা করিয়াছিল, প্রাকৃতিক দুর্বিপাকে, রাজনৈতিক ঘটনাবলীর আলোড়নে ও নিবার্য এবং অনিবার্য বহু অবস্থা বিপর্যয়ে তাহা মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। স্বাধীনতার অভ্যুদয়ে মানুষের আশা আকাঙ্খা জাগ্রত হইয়াছে। কিন্তু স্বাবলম্বী হইবার দৃঢ়তা দেখা দেয় নাই। সর্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দের জন্য সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া মানুষ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে শিথিল হইয়াছে। সরকারী কর্মচারী হইতে বে-সরকারী ব্যাক্তির অধিকাংশের মধ্যে এই শিথিলতা সংক্রামিত হইয়াছে। শাসনযন্ত্রে ও শিল্প বানিজ্যে স্বার্থান্বেষী ভাগ্যান্বেষীর দল নিজ নিজ সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেশময় কলঙ্ক ও দুর্নীতি ব্যাপক করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুর্ভোগ ও অসহায়তাবোধ ক্রমশঃ তীব্র হইয়া উঠিতেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দুমূর্ল্যতা খাদ্যবস্ত্রের অসুবিধা ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, উপার্জন ও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অসমতায় মানুষ নিরুপায় হইয়া শুষ্কমুখে বার বার প্রশ্ন করিতেছে, ইহারই নাম কি স্বাধীনতা? এই স্বাধীনতাই কি ভারতবাসী চাহিয়াছিল? অন্যদিকে একদল লোক বলিতেছেন যে, দেশের জনসাধারণ যেমন, সেই দেশের শাসনতন্ত্রও সেইরূপই হইয়া থাকে। জনসাধারণ যদি সৎ কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও পরিশ্রমী হইত, তাহা হইলে শাসন-পরিচালকগণ কি এরূপ থাকিতে পারিত? এই মতবাদের সমালোচকগণ বলেন সরকারী কর্মচারিগণ যদি সৎ দেশাত্মবোধ সম্পন্ন, কর্তব্যপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে কি দেশের অবস্থা কখনই এত শোচণীয় হইতে পারিত? ভারতের মূল ব্যাধি রহিয়াছে মস্তকে, শাসন যন্ত্রের উর্দ্ধ স্তরে, সুতরাং জনসাধারণকে অভিযোগ করিয়া কি হইবে?

কাহারো উক্তি বা যুক্তি হয়তো উপেক্ষা করিবার মতো নহে। হয়তো উভয় পক্ষের মন্তব্যই সত্য আছে। কিন্তু তাহা আংশিক সত্য, দেশের যাহা কিছু ভালো মন্দ তাহার দায়িত্ব সকলেরই।

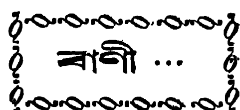
সরকার এবং জনসাধারণ কেহই তাহা অপরের স্কন্ধে চাপাইয়া নিজ দায়িত্ব মুক্ত হইতে পারেন না। স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতবর্ষে এমন কতকগুলি সমস্যা এই বিশাল দেশকে বিব্রত এবং বিপন্ন করিয়াছে যাহা একান্তভাবেই অপ্রত্যাশিত এবং অনন্য সাধারণ। দেশবিভাগের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নাই। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বসতি সমস্যার পূর্ণ সমাধান কবে সম্ভব হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান তাহার প্রতিশ্রুত শান্তি ও সম্প্রীতি ভুলিয়া যে অশান্তি ও উপদ্রবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, তাহার শেষ কোথায় কে জানে? বৈদেশিক শাসনের অবসান ঘটিয়া থাকিলেও বৈদেশিক স্বার্থলোভ প্রশমিত হয় নাই। পাক-ভারত বিরোধেই হউক, কিম্বা আন্তর্জাতিক সমস্যা উপলক্ষেই হউক, উহা নানা আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। কাশ্মীর প্রসঙ্গই তাহার অন্যতম প্রমাণ। শান্তিকামী বিশ্ব কল্যাণ কামী ভারতবর্ষের যে নিজস্ব মনোভাব রহিয়াছে তাহা ক্ষমতা লোভী শক্তি সমূহের সন্দিগ্ধ শ্যেন দৃষ্টি ভারতের উপর পতিত হইয়াছে! কোরিয়ার যুদ্ধে ভারতবর্ষের অভিমত চীনের সম্পর্কে বিশ্ব রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধির আচরণ, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত বিদ্বেষ এর বিরোধিতা, পারস্যের তৈল বিরোধ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অভিমত প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অস্বস্তির কারণ হইয়াছে! এই অস্বস্তির প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক বিষয় ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং পাক-ভারত সম্পর্কের মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অহরহ প্রতিফলিত হইতেছে, তথাপি ভারতবর্ষ তাহার নিজ পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং যুদ্ধের পথ পরিহার করিয়া শান্তির পথে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছে।

মানুষের জীবনে যেমন, জাতীয় জীবনেও তেমনি সুযোগ-দুর্যোগ অনিবার্য। স্বাধীনতা লাভের পরে যে চারি বৎসর অতীত হইল তাহাতে অগ্রগতির পথে ভারতবর্ষ হয়তো আশানুরূপ অগ্রসর হইতে পারে নাই। যতটা করা সম্ভব ছিল তাহাও করা হয় নাই।

তথাপি আকস্মিক বাধা, কিংবা অপ্রত্যাশিত দুঃখ-দুর্যোগ সত্ত্বেও যাহা কিছু বা যতটুকু করা হইয়াছে তাহার সারবত্তাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জাতীয় উন্নতিমূলক পরিকল্পনাটি ভারতের ভবিষ্যৎ পথের সন্ধান দিয়াছে। এবারকার বৈদেশিক খাদ্য আমদানীতে সরকারী মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা দূরীভূত হইয়াছে। বিমান শিক্ষা, নৌ-শিক্ষার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, কৃষির উন্নতির প্রতি সরকার ও জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বাঁধ নির্মাণ করিয়া জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বহু অঞ্চলে চাষের উন্নতি সাধন ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই কিছুটা কার্যকরী হইয়াছে। চারি বৎসরের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলত্রুটি আমাদের সংশোধনের পথ সহজ করিয়াছে। জনসাধারণ ক্রমশঃই এই কঠোর সত্য উপলব্ধি করিতেছে যে, কাহারো নিষ্ক্রিয় সহযোগিতা দ্বারাই দেশবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সফল করিতে হইবে।

অতীতের এই সকল সুখ দুঃখের স্মৃতি বহন করিয়া আবার স্বাধীনতা দিবস উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষয়ক্ষতি কিংবা দুঃখ দুর্ভোগের আলোচনার কাল হরণ করিয়া কাহারো লাভ নাই। যাহা হয় নাই তাহার জন্য সুদীর্ঘ বিলাপ বৃথা। যাহা হইতে পারে বা যাহা হওয়া আবশ্যক সেই পথে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাই প্রগতিশীল জাতির কর্তব্য। আজিকার স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের দেশবাসীকে সেই সঙ্কল্প গ্রহণের কথাই স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। নুইয়া পড়িলেও আমরা যেন নৈরাশ্যে শুইয়া না পড়ি। এই বিশাল দেশের পঁয়ত্রিশ কোটি নরনারীর সম্মুখে যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অফুরন্ত সুযোগ ও অপরিসীম সম্ভাবনা রহিয়াছে; আমরা যেন তাহার যোগ্যতা অর্জন করিতে পারি। পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর সঙ্কল্প ও সক্রিয় সহযোগিতায় কিছুই অসম্ভব নহে। স্বাধীনতা দিবসের স্মৃতি আজ আমাদের ঘরে ঘরে সেই বাণী বহন করিয়া আসিয়াছে, বিপদ্-বাধার মধ্যেও ভয় ভ্রূকুটি তুচ্ছ করিয়া

জানাইতেছে,—'মা ভৈঃ।' আমরা যেন সমগ্র জাতির এই সম্মিলিত সঙ্কল্প সার্থক করিয়া তুলিতে না ভুলি।



কেহ যদি আমার কাছে আসিয়া বলেন, 'বাঙ্গলার জনসাধারণ কি চাহে তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই—আমি বাঙ্গলার নেতা আমি ইহা করিয়াছি—ইহাকে সমর্থন কর' ইহার উত্তরে আমি বলিব, কে হে তুমি? গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল! কে তোমাকে চাহে? জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই আমাদের সর্বস্ব-পণ করিয়াছি, যদি জনসাধারণের মঙ্গল হয় ভালই, নহিলে আমি কে? কেহ নই, নেতাও কিছু নহেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ

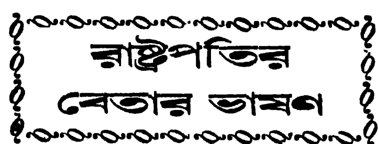
১৯৫২

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী*
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী বিপিন চন্দ্র পাল

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।



আদর্শ নিষ্ঠা ও ত্যাগ স্বীকারের দ্বারা দেশের কল্যাণ সাধনের আহ্বান

চরিত্রবলই জাতির প্রকৃত সম্পদ

নয়াদিল্লী, ১৪ আগস্ট—ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বেতার ভাষণে বলেন, "ব্যক্তিগণকে লইয়া জাতি গঠিত হয় এবং জাতির অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তিবর্গের স্বরূপ ও স্বভাবের দ্বারাই জাতির প্রকৃত পরিচয় নিরূপিত হইয়া থাকে।"

তিনি বলেন, "সরকার আমাদের পক্ষ হইতে সমস্ত জাতির ব্যক্তিগত, নৈতিক ও বৈষয়িক সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন—এইরূপ বিশ্বাস শোচনীয় মানসিক অবস্থার পরিচয় এবং ইহাতে জনগণের সামর্থকেও প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় না।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

৩৬ কোটি নরনারীর সেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান

দিল্লী, ১৫ই আগস্ট—অদ্য এখানে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পঞ্চ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঐতিহাসিক লাল কেল্লার প্রাকারে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু দেশবাসীকে বলেন, "যাহারা লোককে উত্তেজিত করে, ধর্ম্মমত অসহিষ্ণুতা প্রচার করে এবং যাহারা চোরাকারবার ও লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যান্য প্রকার সমাজবিরোধী কার্যে আত্মনিয়োগ করে তাহাদেরই তিনি ভেদ সৃষ্টিকারী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাহারা তাহাদের কার্য-কলাপের জন্য যে কোন সুবিধাই ব্যবহার করুক না কেন—প্রকৃত পক্ষে তাহারা দেশের স্বার্থের ক্ষতি করিতেছে। ইহা তিনি জনসাধারণকে উপলব্ধি করিতে বলেন।"

তিনি আরও বলেন, তাঁহাদের যুগ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। এক্ষণে, যুবজনকে অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে এবং তাঁহাদের স্থান দখল করিতে হইবে। যুব-সম্প্রদায়ের শক্তি ও সামর্থ্যের উপরই নির্ভর করিতেছে দেশের ভবিষ্যৎ এবং অগ্রগতি।

—পি টি আই

আনন্দ বাজার পত্রিকা

স্বাধীনতা দিবস

বর্ষচক্রে আবর্তিত হইয়া ১৫ই আগস্ট পুনরায় আমাদের সম্মুখে সমুপস্থিত। দীর্ঘকালের পরাধীনতার বন্ধন মুক্তির আনন্দে সমগ্র দেশ ও জাতিকে অভিষিক্ত করিয়া এই দিনটি যেদিন প্রথম দেখা দিয়াছিল, সেদিনকার নবজাত উদ্দীপনা আজ হয়ত অনেকটা স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে। তথাপি, যে গৌরবময় স্বাধিকারে দেশ ও জাতি সেদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই গৌরবের ধারা এবং সেই অধিকারের মহিমা আজিও অব্যাহত রহিয়াছে এবং যুগ যুগান্তরকাল ধরিয়া থাকিবে।

১৫ই আগস্ট দিনটি যখন ঘুরিয়া আসে, তখন আমরা যে কেবল সেদিনের সেই উদ্দীপনার কথা এবং ইংরাজের শাসন হইতে মুক্তিলাভের ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা স্মরণ করি তাহা নহে; পরন্তু স্বাধীনতার অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে যে দায়িত্বের ও কর্তব্যের ভার আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আমরা ইতিমধ্যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছি সে কথাও স্মরণ করিতে হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট যেদিন ভারতের শাসন ক্ষমতা ইংরাজ প্রভুশক্তির নিকট হইতে হস্তান্তরিত হইয়া ভারতীয়দের হস্তে আসিয়াছিল, সেদিন আমরা ইহার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম দেশব্যাপী উৎসবের দিবস রূপে। তাহার পর সময় ও ঘটনা যতই অগ্রসর হইয়াছে, আমরা এই দিবসের অনুষ্ঠানে অন্য

প্রকার বিশেষ গুরুত্বও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছি। ইহা কেবলমাত্র উৎসবের দিবস নহে, ইহা আত্ম প্রত্যয়ের অনুভূতি এবং আত্ম পরীক্ষার দিবসও বটে। আজ যখন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি ভবনশীর্ষে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হইবে, তখন সেই অনুষ্ঠানের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের ও আত্মপরীক্ষার কথা যেন সকল চিত্তে উদিত হয়। স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান মাত্র আনুষ্ঠানিক কর্তব্যপালনে পরিসমাপ্ত না হইয়া সকলের জীবনে সত্য ও সার্থক হইয়া উঠুক ইহাই যদি আমাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে আত্মপরীক্ষা ও আত্মপ্রত্যয়ই সেই সার্থকতা লাভের উপায়।

শতাব্দীকালের শাসন ধারার অবসানে বৃটিশশক্তি যেদিন ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লইল, তখন রাখিয়া গিয়াছিল সারা দেশে এক, "লক্ষীছাড়া দীনতা" এবং "দুর্বিষহ পঙ্কশয্যা"। পরিণাম যে এইরূপেই দেখা দিবে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' মহাকবি পূর্ব হইতেই সে সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন করিয়া ছিলেন। সেদিনকার সেই দেশব্যাপী গৃহদাহের বহ্নিজ্বালার মধ্যে সমগ্র জাতি যখন বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম, তখন আর এক মহামানব সত্য ও ধর্মকে সম্বল করিয়া সে গৃহবিপ্লবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। যে কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা শুনিয়াছিলাম, গান্ধীজীর জীবন সাধনার পরিপূর্ণতার মধ্যে সেই শিক্ষাই আমরা বিশেষ করিয়া লাভ করিলাম—যাহা অধর্মের পথ, তাহা কল্যাণের পথ নহে। অধর্মের পথে যাহারা অগ্রসর হয়, তাহারা সাময়িক উন্নতিলাভ করিলেও পরিণামে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর দেশকে ও জাতিকে নূতন ভাবে গঠণের দায়িত্ব যাহারা লইবে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী তাহাদের সম্মুখে চরিত্র ও জীবন গঠণের আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যে চরিত্র সহজে প্রলুব্ধ হইবে সুযোগের সন্ধান পাইবামাত্র নীতিধর্ম ত্যাগ করিয়া, সে চরিত্র স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব বহন করিতে পারিবে না; যে জীবন ত্যাগ স্বীকারের আদর্শে গঠিত হয় নাই এবং ত্যাগ

স্বীকারের ভার যাহা বহন করিতে সমর্থ নহে সে জীবন দেশ গঠনের দায়িত্ব লইতে পারিবে না। প্রত্যেক দেশের এবং প্রত্যেক জাতিরই স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে, বিশেষ করিয়া ভারতের ক্ষেত্রে তাহা সত্য। ভারতের সেই প্রকৃতি যাহারা অনুবর্তন করিয়া চলিতে পারিবে, স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যৎ তাহাদের উপরই নির্ভর করিতেছে।

আজিকার অনুষ্ঠানে ইহাই বিশেষ করিয়া অনুধ্যানের ও উপলব্ধির বিষয়। আজ দেশের রাজ্য পরিষদে, লোক সভায়, বিধান সভায় ও বিধান পরিষদে নির্বাচিত সহস্র সহস্র প্রতিনিধি শাসনযন্ত্র চালাইবার ভার লইয়াছেন। অন্ততঃ শাসনের দিক দিয়া স্বাধীন ভারতের রূপ কি হইবে তাহার একটা আভাস আমরা পাইতেছি। কিন্তু এই সমস্ত দেখিয়াও পূর্বেকার সেই প্রশ্ন বার বার মনের মধ্যে উঠিতেছে—আদর্শের প্রতি নিষ্ঠায় আমরা স্থির আছি কি না এবং আদর্শের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি কি না। বাহিরের আড়ম্বর যতই হউক, আদর্শনিষ্ঠাই ইহার মূল কথা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পাঁচ বৎসর অতীত হইতে চলিল; ইহা সত্য যে, আমাদের সকল আকাঙ্খা, সকল প্রয়োজন ইহারই মধ্যে পরিপূর্ণ হয় নাই, অভাবের এবং দুঃখের ক্লেশ এখনও দেশে যথেষ্ঠই রহিয়াছে। কিন্তু এ সমস্তের মধ্যেও নিজেদের উপর এবং ভবিষ্যতের উপর আমাদের বিশ্বাস অবিচলিত রাখিতে হইবে। সেই বিশ্বাস হইতেই নূতন ভারত পরিপূর্ণ গৌরবে দেখা দিবে। বন্দে মাতরম্।

যুগান্তর

স্বাধীনতা দিবস

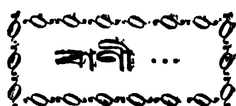
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল! দেড় বা দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষ পর শাসনে জর্জরিত হইবার পর

১৫ই আগস্ট তারিখ যে স্বাধীনতা আসিল, তাহা পূর্ণাঙ্গ ছিল না। কারণ, ভারতবর্ষ তখনও ডোমিনিয়ন ছিল। গণ পরিষদ মারফৎ নূতন ভারতবর্ষের সংবিধান রচিত হইবার পর রিপাব্লিক রাষ্ট্র হিসাবে আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার গৌরব করিতেছি—যদিও ভারত এখনও কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তথাপি ১৫ই আগস্ট তারিখ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই ভিত্তির ওপর প্রজাতান্ত্রিক ভারতের নূতন রাষ্ট্রসৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ কেবল ভারতীয় ইতিহাসের বিচারেই উল্লেখযোগ্য নহে, এশিয়া মহাদেশের দুর্দিনের ইতিহাসের সঙ্গেও ইহার নূতন অধ্যায় স্মরণীয়। ভারতবর্ষের জনসাধারণ দীর্ঘকাল এই স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছে। বলা যাইতে পারে যে, "সিপাহী. বিদ্রোহ" হইতেই ইহার শুরু এবং তারপর বহু প্রকার রাজনৈতিক সামাজিক ও অন্যান্য বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের মধ্য দিয়া এই সংগ্রাম পুষ্টিলাভ করিয়াছে। গান্ধীজীর মহান নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে জনগণকে স্বাধীনতা অর্জনের সক্রিয় সংগ্রামের আহ্বান করেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে কংগ্রেসের সেই মহৎ চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে। অবশ্য শেষ পর্যায়ে নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের সশস্ত্র সংগ্রাম, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের আত্মত্যাগ এবং ভারতীয় সৈন্য বাহিনীর মধ্যে উহার গভীরতর প্রভাব বৃটিশ শাসনকে নিশ্চিত পতনের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। বৃটিশ রাজনীতিক ও শাসকবৃন্দ বুদ্ধিমান, তাঁহারা পরিবর্তিত অবস্থাকে স্বীকার করিয়া আপোষ ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে ওস্তাদ। সুতরাং তাঁহারা যখন অনুভব করিলেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গতিপথে এশিয়া মহাদেশে জনগণের প্রকাণ্ড বৈপ্লবিক জোয়ার আসিতেছে, ভারতবর্ষে এই জোয়ার বৃটিশ-স্বার্থ ও ব্যবসায় এবং বৃটিশ প্রভুত্ব ও অধিকারকে ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, তখনই তাঁহারা ক্যাবিনেট মিশন পাঠাইলেন, আর পাঠাইলেন লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনকে—যিনি ছিলেন রাজরক্তের অধিকারী।

মাউন্টব্যাটেন তীক্ষ্ণধী লোক, তিনি কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগ উভয়কে খুশী করিয়া ভারত ব্যবচ্ছেদসহ স্বাধীনতার দাবীতে আপোষ রফা ঘটাইলেন। পার্লামেন্টে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল গৃহীত হইল, এবং ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইবার পর ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করা হইল। বহু যুগের পর ভারতীয় জনগণ মুক্তির আস্বাদ পাইয়া বিপুল আনন্দে মত্ত হইলেন এবং লর্ড লুই মাউন্ট ব্যাটেনকে "কংগ্রেসী বড়লাট রূপে" অভিনন্দন জানাইলেন। কিন্তু "আপোষে স্বাধীনতা" এবং ভারত বিচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িকতার জন্য যে অনিবার্য দুঃখ কপালে লেখা ছিল তাহা শীঘ্রই দেখা দিল দেশব্যাপী দুর্গতির মধ্যে। গত পাঁচ বৎসর ভারতবর্ষ এই দুর্গতির মধ্য দিয়া চলিয়াছে এবং কবে ইহার অবসান হইবে, তাহাও বুঝা যাইতেছে না। ফলে, স্বাধীনতার স্বাদ আজ তিক্ত লাগিতেছে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার গ্লানির মধ্য দিয়া বিগত বৃটিশ শাসনের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ অপেক্ষা স্বদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ করিতেছে। এই কঠোর সত্যকে আজ আর উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। সুতরাং স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে জনগণের চিত্তে কোন উল্লাস নাই।

বিংশ শতকের অর্ধেক অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং জনগণের এক বৃহৎ অংশ এক্ষণে অনুভব করিতেছেন যে, কেবল ভৌগলিক স্বাধীনতা কিংবা জাতীয় স্বাধীনতাই যথেষ্ট নহে। যদি একমাত্র স্বাধীনতাই যথেস্ট হইত, তবে এশিয়ার অনেক দেশ স্বাধীন হওয়া সত্ত্বেও এত দুর্দশার মধ্যে পড়িত না। দুই শতাব্দীর অধিককাল ভারতবর্ষ সহ এশিয়ার দেশগুলি কেবলমাত্র কাঁচামালের দেশ কিম্বা উপনিবেশ হিসাবে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি কতৃক শাসিত ও শোসিত হইয়াছে। আধুনিক শিল্প বিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান এবং কৃষি-বিজ্ঞানের দিক হইতে আমরা বহুদূর পিছনে পড়িয়াছিলাম। দেশের প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য আহরিত হয় নাই—হইয়াছে বিদেশী বণিকবৃন্দের মুনাফাবাজীর জন্য। যেটুকু শিল্প বাণিজ্যের পত্তন

হইয়াছে, উহার সারাংশ গিয়াছে বিদেশী রাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য। আবার পর পর দুইটি মহাযুদ্ধ আসিয়া পৃথিবীর সমগ্র অর্থনীতি, সমাজনীতি ও শ্রম-শিল্পনীতিকে প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গিয়াছে—এমন কি ভিত্তিমূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়াছে। ফলে, ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশের জনসাধারণ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। ইহার সঙ্গে মহাযুদ্ধের অন্যান্য উপসর্গ যেমন, মুদ্রাস্ফীতি; চোরাকারবার এবং দেশের আভ্যন্তরীণ জীবনে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও উদ্বাস্তু সমস্যা সমগ্র অবস্থাকে জটিল এবং ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত জরুরী অবস্থার সঙ্গে লড়িবার জন্য যে ধরণের বৈপ্লবিক জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল, তাহা গৃহীত হয় নাই। বৃটিশ আমলেই ছক-বাঁধা পথে কংগ্রেসী আমলের রাজত্ব চলিতেছে এবং নূতনতর আমলাতন্ত্র গণতন্ত্রের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই গণতন্ত্রকে সফল করিতে হইলে, রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সাম্য, ন্যায় বিচার এবং ধন-বণ্টনের মধ্যে সুবিচার থাকা চাই। অন্যথা নূতন যুগের গণতন্ত্র যেমন সার্থকনামা হইতে পারে না, তেমনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জনগণের মুক্তির বাহক হইতে পারে না। যতদিন জনগণের অদৃষ্টে অর্থনৈতিক দাসত্ব থাকিবে এবং কেবলমাত্র রুটির জন্য একদল শক্তিশালী মুষ্টিমেয় লোকের উপর সমাজের বাকী সমস্ত লোক নির্ভরশীল থাকিবে, ততদিন মুক্তির আলোকে এই দেশ উদ্ভাসিত হইবে না। তথাপি স্বাধীনতা দিবসের সার্থকতা আছে এজন্য যে এক্ষণে জনসাধারণের হাতে যে সমস্ত অধিকার আসিয়াছে, যদি নূতন যুগের অর্থনীতি ও রাজনীতির আদর্শের দ্বারা উহা বুদ্ধিসম্মত উপায়ে প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে এই বিষণ্ণ দেশ ও জাতির ভাগ্য ইচ্ছানুসারে নিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা পাইয়াছি এবং সেই অধিকার প্রয়োগের জন্য আমাদের মধ্যে যে চেতনা ও দুর্জয় সঙ্কল্পের প্রয়োজন, তাহা যেন আমরা আজ স্মরণে আনিতে পারি। মানুষের মুক্তির জন্যই স্বাধীনতা। কেবল স্বাধীনতার জন্য মানুষ নহে—বর্তমান যুগের এই নূতন আদর্শের দ্বারা আমরা যেন স্বাধীনতা দিবসে উদ্বুদ্ধ হইতে পারি। জয়হিন্দ্‌!



ভারতের বৈশিষ্ট্য যে কি, ইহা যাহারা বোঝেন এবং সর্বদা স্মরণ করিয়া চলেন, তাহারা সমগ্র ভারতের ঐক্য সাধনের লোভে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যকে কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। ভারতের এই বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আজ বাঙালী প্রত্যক্ষ বাংলাকে ভুলিয়া, অপ্রত্যক্ষ যে ভারতবর্ষ নামে কল্পিত বস্তু, তাহার পশ্চাতে ছুটিতে চাহে।

বিপিন চন্দ্র পাল

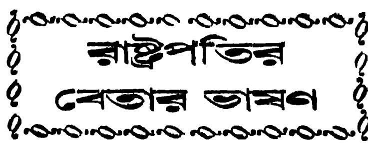
১৯৫৩

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী বঙ্কিমচন্দ্র

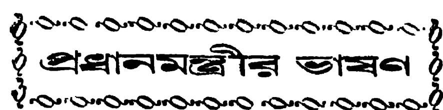
*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।



বিশ্বের কল্যাণ সাধনে আত্মোৎসর্গের আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—"আসুন আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের এই ষষ্ঠবার্ষিক দিবসে আমাদের জনগণের সুখসমৃদ্ধি এবং বিশ্বের কল্যাণ সাধনের সুমহান কর্তব্যে পুনরায় আত্মোৎসর্গ করি।......শুধু আমাদের নিজ জাতি নহে, সমগ্র মানব জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির নীতিই আমরা মানিয়া চলিব।"

তিনি বলেন, "সংবিধান অনুসারে ভারতে জনকল্যাণব্রতী রাষ্ট্র স্থাপনই আমাদের লক্ষ্য। যত শীঘ্র সম্ভব এই লক্ষ্য কার্যকর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে আমরা দৃঢ় সংকল্প।"



সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বই ভারতের কাম্য

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—অদ্য ষষ্ঠ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দিল্লীর লালকেল্লার শীর্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বিশাল জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, 'আমাদের প্রথম কর্তব্য হইল, আমাদিগকে আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হইবে।'

'আমাদের দ্বিতীয় কর্তব্য হইল, আমাদিগকে শান্তির পথ ধরিয়া যাইতে হইবে এবং পৃথিবীর সকল দেশের বন্ধুত্ব অর্জন করিয়া আগাইয়া যাইতে হইবে।'

'আমাদের তৃতীয় কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহা হইল আমাদের ৩৬ কোটি নরনারীকে লইয়া গঠিত এই বিরাট পরিবারের কল্যাণ ব্যবস্থা।

পি, টি, আই

স্বাধীনতা দিবস

পরাধীনতার দুঃসহ-বন্ধন মুক্তির স্মৃতিমণ্ডিত স্বাধীনতা দিবসে আমরা পূর্বগামী স্বাধীনতার সৈনিকদের উৎসর্গময় শ্রদ্ধাসম্মত প্রণাম নিবেদন করিতেছি। বহু নরনারীর দুঃখের মূল্যে অর্জিত দুর্লভ দুঃখের ধন এই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে সার্থক ও সফল করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া যাঁহারা দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহারাও এই শুভদিনে আমাদের প্রীতিনমস্কার গ্রহণ করুন।

ভারতবর্ষের বহু শতাব্দীর ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইহা এক বৃহৎ পট পরিবর্তন। বড় বড় রাজপ্রতাপের উত্থান ও পতনের পর বৃটিশ-বণিক-সাম্রাজ্য এক অভিনব ব্যাপার। ইংরাজ কেবল বণিক রূপে নহে, নব্য ইউরোপের চিত্তদূতরূপে আসিল। প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ভারতের চিত্ত স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির আঘাতে প্রচণ্ড বেদনা পাইয়া মূর্ছিত হইয়া আপনার অতীতের খোলার মধ্যে আত্মগোপন করিয়াছিল। বৃহৎ পৃথিবীর নিত্য সম্মুখগামী মানুষের মহান ইতিহাস জয়শঙ্খধ্বনিতে দিক মুখরিত করিয়া তাহার গৃহদ্বারে দাঁড়াইল। আমি আসিয়াছি সেই নব যুগের বার্তা লইয়া, যে যুগ জাতি-বর্ণ-বংশ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকারের বার্তা ঘোষণা করে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক সুবিচারের নূতন বাণী নব্য-ভারত শুনিল, বুদ্ধির আলস্যে

কল্পনার কুহকে, অতীত যুগের প্রথা নিষেধের অন্ধ অনুবর্তনায় অচল হইয়া থাকিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। মানুষের নব নব অধ্যবসায়শীল যৌবনধর্মকে প্রাচীন মন্ত্রে সম্মোহিত করিয়া রাখিও না। বহু দিনের শুষ্ক মাটি যেমন আকাশের জলধারা ভারতের চিত্তকে সজীব করিয়া তুলিল। ভারতের নব জাগরণ যে বিশ্বচিত্ত উদ্বোধনের অঙ্গ—ভারতের মনীষা তাহা অকুতোভয়ে ঘোষণা করিল।

নব্য ভারত অস্ত্রে ও বর্মে সজ্জিত হইয়া রণক্ষেত্রে দেখা দিল। স্ব-জাতির দুর্বুদ্ধির বিরুদ্ধে অভ্যস্ত চিন্তার জড়ত্বে যুক্তিহীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ আচার নিয়ম প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম তাহার গতিপথে স্বাভাবিকভাবেই পরাধীনতা ও পরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিল। ভারতের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির এই সঙ্ঘর্ষের ইতিহাস। সূচনায় নব্য শিক্ষিত ভারতবাসী চাহিয়াছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বায়ত্বশাসন। সেদিন মুষ্টিমেয় দুঃসাহসী বিপ্লবী ছাড়া পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কেহ মুখেও উচ্চারণ করিতেন না। নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিকগণ চালিত জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন হইতে গান্ধী-যুগে স্বরাজ্যলাভের লক্ষ্যে পৌঁছিল। প্রশ্ন উঠিল—স্বরাজ অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট, উহার স্বরূপ কি হইবে; গান্ধীজী বলিলেন, ভবিষ্যতের স্বরাজ ভবিষ্যতের স্বরাজপন্থীরাই ঠিক করিয়া লইবে, এখন সংগ্রামই মুখ্য প্রশ্ন।

তরুণ ভারত শান্ত হইল না। বৃটেনের কুটনীতি, ভেদনীতি এবং এক হস্তে সামান্য সংস্কার দিয়া অপর হস্তে তাহা অপহরণ করিবার কৌশলে ভারতের স্বাধীনতাকামীরা বিরক্ত ও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। অবশেষে জাতীয় কংগ্রেসে তরুণ ভারতের জয় হইল। ১৯২৯ এর ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভই জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইল। কপট রাজনীতির ছলনাময় বাক্‌চাতুরীর মোহমুক্ত ভারতের স্বাধীনতার দাবী অকুণ্ঠ ভাষায় বিশ্বজগতে ঘোষিত হইল। ভারতের

প্রতি কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ নরনারী জাতীয় পতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের সঙ্কল্প ঘোষণা করিল।

বীরের শোণিতসিক্ত পথে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আগাইয়া চলিল। রাজশক্তির চণ্ডনীতি এবং প্রজাশক্তির অনির্বাণ সঙ্ঘর্ষের বিরোধে, দেশদ্রোহিতা কৃতঘ্নতা আত্মখণ্ডনের দুর্মতির হলাহল ফেনাইয়া উঠিল, তরুণ ভারত নীলকণ্ঠের মত অকম্পিত করে সেই বিষ অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়া প্রমাণ করিল সে মৃত্যুঞ্জয়। এমন সময় সাম্রাজ্যভোগীর সহিত সাম্রাজ্যলোভীর সংগ্রাম সপ্তসমুদ্রের তীরে তীরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। মহাকালের প্রলয়তাণ্ডবে সৃষ্টি বুঝি রসাতলে যায়! মহাযুদ্ধের কালরাত্রিও পোহাইল। ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদ ভারত ছাড়িবার পূর্বে জাতির মর্ম-কেন্দ্রে সর্বশেষ আঘাত হানিয়া গেল। রাষ্ট্রনীতিক বিচ্ছেদকে স্বীকার করিয়া লইয়া দ্বিখণ্ডিত ভারতে স্বাধীন হইলাম।

স্বাধীনতার সপ্তম বার্ষিক অনুষ্ঠান দিবসে সম্মুখে পশ্চাতে চকিত হইয়া চাহিতেছি অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঠাহর পাইতেছি না। এই কি আমাদের ললাট-লিখন যে, অতীত ব্যবস্থার প্রেত-র্তিগুলি আমোদের ভবিষ্যতকে সদর্পে অধিকার করিয়া থাকিবে? বিশ্বজোড়া মনুষ্যত্বের জয়যাত্রার পথপ্রান্তে আমরাই কি হতোদ্যম নৈরাশ্যে বসিয়া কেবল পরের অপরাধ গণনা করিব? দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, আছে বাধা ও বিপত্তি—যাত্রার পথ দুর্গম। কিন্তু এই দুর্গম পথই আজ নব্য ভারতকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা ওঠ, অগ্রসর হও। তোমাদের মনুষ্যত্ব ও পৌরুষ সর্বমানবের মুক্তিকামনায় দীপ্তিমান হইয়া উঠুক। আজিকার দিনে নব মহাভারত রচনায় ঐতিহাসিক নিয়োগ তোমরা রচনা কর। স্বাধীনতা দিবসে অযুত মিলিতকণ্ঠে বজ্রস্বরে ঘোষণা করো—আমরা অগ্রসর হইব। দেশজননী স্রক চন্দনহস্তে তোমাদেরই প্রতীক্ষায় সাগ্রহে পথের পাশে উৎসুক নেত্রে দাঁড়াইয়া আছেন। বল,—বন্দে মাতরম্!

দৈনিক বসুমতী

১৫ই আগস্ট

আজ ১৫ই আগস্ট। দেশের শাসকরা আজ উৎসব আড়ম্বরের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে ব্যস্ত! কিন্তু ভারতবর্ষের শতকরা ৯৯জন লোকের মনে প্রশ্ন উঠিয়াছে—এ স্বাধীনতা কাহার স্বাধীনতা? যে স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হইয়া একদিন ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত সহস্র সহস্র তরুণ-তরুণী জীবন পণ করিয়া সংগ্রাম করিয়াছিল, এই কি তাহার রূপ? যে স্বাধীনতার কল্যাণে দেশ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়াছে, অনাহার ও দুর্ভিক্ষ দেশবাসীর চিরসঙ্গী হইয়াছে, বেকারীর জ্বালায় মানুষ আত্মহত্যা করিতেছে—আর মুষ্টিমেয় দেশী ও বিদেশী কায়েমী স্বার্থভোগী স্ফীতোদর হইয়া উঠিতেছে, সে স্বাধীনতার নামে দরিদ্র, নিঃস্ব সর্ব্বহারা ভারতবাসী উল্লাসে উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করিবে কিরূপে?

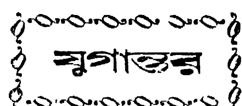
১৯৪৭ সালে পনেরই আগস্ট অনেক আশা, অনেক ভরসা লইয়া দেশবাসী একবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ছয় বৎসর কংগ্রেসী শাসনের ফলে সে সব আশা ভরসাই আজ নিঃশেষে ধুলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। '৪৭ সালের পূর্ব্ববর্ত্তী আমলে কংগ্রেস ভারতবাসীকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহার কোন প্রতিশ্রুতির মর্যাদাই কংগ্রেসী রাষ্ট্রনায়কেরা রাখেন নাই। ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রতিশ্রুতি শুনাইয়া ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস জয়লাভ করে। কিন্তু '৪৭ সালে ক্ষমতা লাভের সময় প্রথমেই সেই প্রতিশ্রুতিকে

জবাই করা হয়। তারপর হইতে একটির পর একটি করিয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিকেই চোথা কাগজের টুকরির মধ্যে নিতান্ত অসঙ্কোচে কংগ্রেস নেতারা নিক্ষেপ করিয়াছেন। ফলে আজ ১৯৫৩ সালের ১৫ই আগস্ট দেখিতেছি, বৃটিশ আমলে যেমন ভারতের অগণিত মানুষ মুষ্টিমেয় ক্ষমতা গর্বিত, ধনমদমত্তের পদতলে পড়িয়া লাঞ্ছিত ও নিষ্পিষ্ট হইত, আজও তেমনই হইতেছে। আজও ভারতবর্ষ বৃটিশ কমনওয়েলথের লেজুড় হইয়া আর্থিক ও রাজনৈতিক খেসারতের বোঝা বহন করিতে বুকের রক্ত জল করিতেছে। আজও বিদেশী শ্বেতাঙ্গ মালিকের শোষণ চলিতেছে অব্যাহত গতিতে। আজও দেখিতেছি ভারতের গ্রাম ও শহরের দরিদ্র নরনারী দুটি মুষ্টি অন্নের জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে—তবুও অন্ন মিলিতেছে না। জমিদার ও মহাজনের শোষণ, দুর্বিবপীত ধননীতির শোষণ, বৃটিশ আমলের পুরাতন ভাবধারায় পরিপুষ্ট পুলিস অফিসারের অত্যাচারে দুর্নীতিপুষ্ট সরকারী কর্মচারী ও উপর-ওয়ালাদের লুণ্ঠন সমস্তই আজ খণ্ডিত ভারতের অঙ্গের শোভাবর্ধন করিতেছে। স্বাধীনতার এই বীভৎস বিকৃতিকে স্বাধীনতা আখ্যা দেওয়া নিতান্তই ধৃষ্টতা।

১৫ই আগস্ট তাই উৎসব নয়, আত্মানুসন্ধানের দিন। একথা আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে, '৪৭ সালের ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতির মধ্যেই একটা মস্ত বড় ফাঁক ছিল—তাই স্বাধীনতার বাঞ্ছিত ফল আমরা পাই নাই। আপোষহীন সংগ্রাম ও বিপ্লবের ভিতর দিয়া যে স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্ন দেখিয়া নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করিয়াছিলেন—কংগ্রেস সেই পথে ক্ষমতালাভ করে নাই। কংগ্রেস ক্ষমতালাভ করিয়াছিল বিপ্লব-বিরোধীতার ভিতর দয়া; আপোষের কলংকিত পথ ধরিয়াই কংগ্রেস নেতারা দিল্লীর মসনদে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাই শ্বেতাঙ্গ কোট-প্যাণ্টধারী শাসকের বদলে আমরা কৃষ্ণাঙ্গ খদ্দরধারী শাসক পাইলাম সত্য—কন্তু সাম্রাজ্যবাদের! অর্থনৈতিক ও সামরিক নাগপাশের কবল

হইতে আমরা মুক্তি পাইলাম না। আজও প্রতিটি পদক্ষেপে তাই আমাদের পুরাতন দিনের শৃঙ্খল পায়ে বাজিতেছে। ভারতের বর্তমান শাসন কাঠামোর সঙ্গে তাই বৃটিশ ভারতের সামাজিক অর্থ-নৈতিক শাসন কাঠামোর এতটুকু পার্থক্য নাই।

১৫ই আগস্ট হয়ত কংগ্রেস নেতাদের স্বাধীনতা উৎসব। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জ্জনের কাজ এখনো বাকি আছে। যেদিন ছাঁটাই ও বেকারীর ভয়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত সন্ত্রস্ত হইতে হইবে না, যেদিন দুর্ভিক্ষ ও অনশনের জ্বালায় গৃহস্থ পরিবারকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে না, যেদিন বাসস্থানের অভাবে শত শত নরনারী ও শিশু ফুটপাতে ও আস্তাবলে বর্ষা ও শীতের রাত্রি অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইবে না—সেইদিন আসিবে আসমুদ্র হিমাচল ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতা, সেই দিনই আসিবে মুক্তি, সেই দিনই প্রকৃত স্বাধীনতা উৎসব ও আনন্দের দিন আসিবে।



পনেরোই আগস্ট

আজ ভারতের সর্বত্র স্বাধীনতার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব প্রতিপালিত হইবে। বহুবাঞ্ছিত স্বপ্ন যখন সত্যে পরিণত হয়, তখন তাহা স্বভাবতঃই বহু আশা আকাঙ্খা বহন করিয়া আনে। ভারতের স্বাধীনতা ও জনচিত্তে আনন্দ আনিয়াছে, আশা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে

একই শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিমাত্রেরই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বাজারে সমানাধিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, শিল্প ও জাতি সংগঠন নূতন পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতের বৈদেশিক নীতি সমগ্র বিশ্বের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বাহিরে ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার চেষ্টা চলিয়াছে। খাদ্যশস্যের অধিক উৎপাদন ও জল সরবরাহের জন্য বহু পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই কার্যকরী হইয়াছে। কাগজ-পত্রে এই সকল পরিকল্পনার একটি মনোহারী রূপ অবশ্যই আছে, আজ না হউক, আগামী কাল অথবা আগামী কাল না হইলেও অদূর ভবিষ্যতে সর্বাঙ্গীন উন্নতি পরিকল্পনা সুস্পষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই মনোহারী রূপ যতই চাকচিক্যময় হউক, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে উহা সম্যক প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। সুতরাং একদিকে যাহা উজ্জ্বল ও আশাদীপ্ত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে ঘরের অন্ধকার তাহা আরো গভীর করিয়া তুলিয়াছে। একদিকে রঙীন পরিকল্পনার অতিবৃষ্টি, অন্যদিকে দৈনন্দিন অভাব-অনটনের তীব্র হাহাকার। এই অসহনীয় অবস্থার পীড়নে পড়িয়া মানুষের আনন্দ উৎসবও নিরানন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। স্বাধীনতার ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসবের দিনে জনচিত্তে যে প্রাণচাঞ্চল্য ও আনন্দানুভূতি হওয়া স্বাভাবিক তাহা আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইতে পারিতেছে না। খাদ্যের অনটন, বস্ত্রের দুর্মূল্যতা, বেকার সমস্যার ক্রমবর্ধমান তীব্রতা, যানবাহনের ভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে। বাহিরের সমারোহের মধ্যে অন্তরের এই নিঃস্বতা ভয়াবহ। সমাজজীবন আজ এমন এক দৈন্যের আঘাতে আলোড়িত যে, ভালো জিনিষকেও আরো ভালোভাবে গ্রহণের উপায় নাই। ভবিষ্যতের শত আশা, আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি আর কাহারও প্রাণে

কোন সাড়া জাগায় না। জমিদারির উচ্ছেদ হইতেছে, কিন্তু কৃষি উন্নতির লক্ষণ নাই, উন্নত জীবন যাত্রার জন্য সকলেই আকুল। কিন্তু অবনত জীবনের গ্লানিভার দুর্বিষহ। শাসনযন্ত্রের মধ্যেই সর্বস্তরে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে নানা প্রকারের দুর্নীতি অহরহ এরূপ ভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাইতেছে, যাহাতে আশা অপেক্ষা হতাশাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। নৈতিক জীবনের একটা সর্বাঙ্গীন অধোগতি মানুষের চৈতন্য অসাড় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবার উপক্রম। ভালোর পরিবর্তে মন্দটাই স্বাভাবিক হইয়া দেখা দিতেছে!

এমন সময় কেহ আসিয়া যদি বলে,—ওঠ, জাগো। আজ যে স্বাধীনতা দিবসের সুপ্রভাত—তাহা হইলে সুপ্তোত্থিতের মতোই তাহাতে আকস্মিক চাঞ্চল্য সঞ্চার করে না। স্বাধীনতা? কিসের স্বাধীনতা? কোথায় স্বাধীনতা?—জীর্ণ বসন, শীর্ণ বদন,—অন্ন, অর্থ ও কর্মাভাবের শত পীড়নের মধ্যে আনন্দের উৎসাহ কোথায়? কেন এমন হইল, কি করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের উৎসাহ ১৯৫৩ সালের আগস্টে এত ম্লান হইয়া পড়িল, তাহা কে বুঝাইবে? একদিন, এক বৎসর বা পাঁচ বৎসর একটি জাতির উন্নতির পক্ষে কিছুই নহে বলিয়া যে শিশু-রাষ্ট্রের বিজ্ঞ শাসকগণ দেশবাসিকে শান্ত করিতে চাহেন, তাহাদের নিকটেই জনসাধারণ আজ হতাশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিতেছে যে, আমাদের স্বাধীনতার আনন্দই বা কোথায়, স্বাদই বা কোনখানে? পণ্যমূল্য ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে, উপার্জনের পথ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে, আর ট্যাক্সের ক্রমবর্ধমান পীড়ন লঘুরাঘাতের মতোই মানুষের মাথায় আঘাত হানিতেছে। শিক্ষার ব্যয় সাধ্যের সীমা অতিক্রম করিতেছে, চিকিৎসার ব্যয় সুস্থ লোকেরও শিরঃপীড়া ঘটাইতেছে; বৃটিশ শাসনের জাক-জমক অক্ষুন্ন রহিয়াছে, লাট-প্রাসাদে অতিথির ভীড়, মন্ত্রিদের ভ্রমণ-বিলাস, উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীদের অত্যাধিক বেতন দেশের অর্থ শুষিয়া লইতেছে। শিল্পবাণিজ্য সঙ্কুচিত হইতেছে, নিজেদের জালে

নিজেরাই জড়াইয়া পড়িয়া শাসকগণ হায় হায় করিতেছেন। বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করিয়া দিতেছে।

এরূপ অবস্থায় স্বাধীনতা দিবসের ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান পালন করিতে হইবে। কি করিয়া এই অসহনীয় অবস্থা সহনীয় করা যায়, তাহার পন্থাই ভাবিতে হইবে। এই বিশাল দেশের বিপুল সমস্যার সর্বগ্রাসী আক্রমণ কি উপায়ে প্রতিহত করা সম্ভব, সেই কথাই ভাবিতে হইবে সকলের আগে। আর্থিক অসামঞ্জস্যের সামঞ্জস্য বিধান করিতে না পারিলে এই অবস্থার পরিত্রাণ নাই। জাতীয় জয়যাত্রার অগ্রগতিতে আমরা সত্যই আগাইয়া চলিতেছি, না পিছাইয়া পড়িতেছি, তাহার বোঝাপড়া আজই করিতে হইবে। ভারতের বর্তমান শাসকগণ যে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখাইতেছেন, তাহার পশ্চাতে আর্তের হাহাকার যে কিরূপ ভীষণ বিসদৃশ্য হইয়া উঠিতেছে, অকস্মাৎ দুই একটি হরতালে তাহা বিজলী চমকের মতোই আত্মপ্রকাশ করিতেছে। ছাটাই-এর কাঁচি নির্মমভাবে চালাইয়া যাঁহারা স্বাধীনতার উৎসব পালনে আহ্বান জানান, জনচিত্তের সহিত তাঁহাদের কোন সংযোগ নাই। এই কারণেই রাষ্ট্রপাল বা রাজ্যপাল ভবনেই স্বাধীনতার উৎসব সমারোহ কেন্দ্রীভূত হইতেছে, বাহিরের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জনসাধারণ তাহার বাহিরেই পড়িয়া থাকিতেছে। শহরের সদরের কোলাহল যতই বাড়িতেছে, অন্তরের আনন্দ ততই নির্বাসিত। এই উৎসব নেতাদের উৎসব, জনতার উৎসবের এখনও অনাগত।

বাণী ....

সকল ধর্মের উপর স্বদেশ-প্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না,..... .... যে মনুষ্য জননীকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতির মধ্যে হতভাগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র

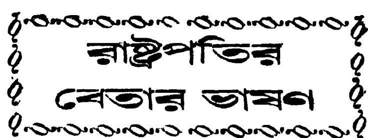
১৯৫৪

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি



দেশের সমৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক শান্তির সঙ্কল্প গ্রহণে আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—"আমাদের স্বাধীনতা লাভের আজ সাত বৎসর পূর্ণ হইল। আমাদের জাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ। সে জন্য আমরা স্বভাবতই প্রতি বৎসর সানন্দে এই দিনটি পালন করিব এবং এই উপলক্ষে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পুনরায় সঙ্কল্প গ্রহণ করিব।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

গোয়াকে অবশ্যই মুক্ত ও ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতার সপ্তম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার হইতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, 'গোয়া বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের পরীক্ষার স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং গোয়া সংক্রান্ত মনোভাবের দ্বারাই উপনিবেশিকবাদ সমস্যা সম্পর্কে এই সকল রাষ্ট্রের মনোভাব প্রকাশ পাইবে। গোয়াকে অবশ্যই বৈদেশিক শাসনমুক্ত এবং স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।'

তিনি বলেন, 'ভারতের অধিবাসীর প্রত্যেকের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক সমান অধিকার থাকিবে এবং পুরাতন জাতিভেদ প্রথা ও অনুরূপ অন্যান্য সমস্ত কলঙ্কজনক রীতিনীতি ভারতের বুক হইতে সমূলে উচ্ছেদ করিতে হইবে—ইহাই নবভারতের বাণী।'

তিনি বলেন, 'প্রত্যেক ভারতবাসীকে একটি কথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী না হইলে, বৈদেশিক ব্যাপারে কার্যকরী কোন ভূমিকা গ্রহণ ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়।'

পি, টি, আই

স্বাধীনতা দিবস

১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্মদিন, জীবনযাত্রা পথে সাতটি বছর পার হইয়া স্বাধীন ভারত অষ্টম জন্মদিবসের পুন্যতীর্থে উপণীত হইয়াছে। এই দিনে একবার পিছনের দিকে তাকাইয়া লাভ ও ক্ষতি, জয় ও পরাজয় ইত্যাদির হিসাব করিতে হইবে, তারপর আশা ও সঙ্কল্প লইয়া ভবিষ্যতের দিকে ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবে। তার পূর্বে আমাদের একটি বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে তাহা আমাদিগকে পালন করিতে হইবে। দীর্ঘ সাধনায় ও সংগ্রামে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, বহু বীরের প্রাণদান, বহু সাধকের সাধনা এবং বহু কর্মীর প্রচেষ্টা স্বাধীনতার বেদী মূলে নিবেদিত রহিয়াছে, তাঁহাদিগকে এই পূণ্য দিবসে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করাই আমাদের সেই প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ভারতের সেই সব বীর, সাধক ও কর্মী, খ্যাত ও অখ্যাত সকলকেই আমরা আজ শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। আর স্বাধীন ভারতের গঠণ ও উন্নয়নেও যাঁহারা এই গত সাত বছরে স্ব স্ব ক্ষেত্রে আত্মদান করিয়াছেন তাঁহাদের ঋণও আমরা আজ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিতেছি।

অতীতের দিকে তাকাইয়া গত সাত বছরের যে চিত্রটি দেখিতে পাই, তাহাতে আশা ও উৎসাহেরই সঙ্গত কারণ রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। বহু সমস্যার সমাধান আমরা করিতে পারি নাই, ইহা সত্য, কিন্তু জোর দিয়াই একথা আজ ঘোষণা করা চলে যে,

আমরা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছি। আজ আমরা বলিতে পারি যে, পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র রাষ্ট্র ভারত তাহার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক যে ভূমিটি স্পর্শ করিয়া আছে তাহা বস্তুতঃই দৃঢ় ও স্থায়ী। এই দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তির উপর যে ভারত গড়িয়া উঠিতেছে এবং উঠিবে, শুধু এশিয়ারই নহে, সারা পৃথিবীরই শান্তি ও অগ্রগতির তাহা প্রধানতম ধারক ও বাহক হইবে, এই সম্ভাবনাই দেখা যায়। ইহাকে শুধু স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া নিশ্চয়ই চলে না। সন্ত অতীতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইব যে, কোরিয়া ও ইন্দোচীনকে কেন্দ্র করিয়া যে বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন হইয়া আসিয়াছিল, বিশেষ ভাবে ভারতেরই প্রচেষ্টায় তাহা আজ নেপথ্যে অপসৃত হইয়াছে। পৃথিবীর বৃহৎ শক্তি সমূহ, যাহাদের ধনবল ও অস্ত্রবলের তুলনায় নবীণ ভারত নিতান্ত দুর্বল, তাহারাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই দান ও কীর্তি অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার পাইয়া থাকে। এই প্রাপ্যটুকু আমরাও যেন অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করি এবং একদিন শক্তিমান ভারত বিশ্বসভায় প্রধান আসনটিই গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকে আর সপ্ন মনে না করিয়া নিশ্চিত সম্ভাবনারূপেই যেন আমরা গ্রহণ করি। মাত্র সাত বছরের স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের এই অসামান্য কীর্তি ও সাফল্যের মধ্যে অপরিমিত আশা ও অসীম উৎসাহেরই কারণ রহিয়াছে, অতীতের হিসাব করিতে গিয়া জমার খাতায় ইহাই আমাদের পাথেয় রূপে সঞ্চিত হইয়াছে দেখিতে পাই। তাই বলিতে পারিয়াছি যে, ভারত ভাগ্য-বিধাতা সত্যই আমাদিগকে সঙ্কট পার করিয়া মহৎ স্বপ্ন ও বিরাট সম্ভাবনার দ্বারে আনিয়া এবার উপণীত করিয়াছেন।

গত সাত বছরের হিসাব লইলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও ভারতের লব্ধ সাফল্য তুচ্ছ বলা চলে না। মানুষের প্রধান সমস্যা খাদ্য সমস্যা, খাদ্যাভাবের দুর্দিন আমরা পার হইয়া আসিয়াছি এবং অচির কাল মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতাই শুধু নহে, প্রাচুর্যেরও আমরা আশা এখন করিতে পারি। কয়েকটি বৃহৎ পরিকল্পনা প্রায় শেষ হইয়া আনা

হইয়াছে, সেগুলি যখন ফলদান করিতে আরম্ভ করিবে, তখন খাদ্যাভাব কথাটি ভারতের শব্দকোষ হইতে লুপ্ত হইবে, এই ভরসাও আমরা নিশ্চয়ই করিতে পারি। খাদ্য সমস্যা সমাধানের জাতীয় অর্থনীতির দৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ, ইহা মনে রাখিলে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ ও স্বার্থকতা দুই-ই বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতেছে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকে বস্তুতঃ ই আমরা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছি। শিল্পেও উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে; দেশের শ্রমিক সমাজের উল্লেখযোগ্য বৃহৎ একটা অংশই রোগের চিকিৎসা, আকস্মিক অক্ষমতা, প্রসূতি ও শিশু-পালন ইত্যাদি ব্যাপারে আইনের বলে প্রভূত সাহায্যের আজ অধিকারী হইয়াছে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যেকার সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটিয়াছে। কাজেই গত সাত বছরের হিসাবের পর একথাও আমরা জোর দিয়া নিশ্চয়ই বলিতে পারি যে, অর্থনৈতিক দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া ভারত এখন দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পুরোভাগেই স্থানটি গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু বিশেষ একটি সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে এবং তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত আকারই গ্রহণ করিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়। সমস্যাটি হইল দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার চার বৎসর পার হইয়াছে, কিন্তু সমস্যাটির হ্রাসে তাহা এখনও তেমন কিছু করিতে সমর্থ হয় নাই। জাতির এই প্রবীণতম সমস্যাটিকে সম্মুখে রাখিয়াই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাই দেশের গভর্ণমেণ্ট আশা করেন যে, দেশের বেকার সংখ্যার বৃহৎ একটি অংশের জন্যই কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা এবার করা যাইবে। এই আশা সত্ত্বেও আমরা যেন না ভুলি যে, বেকার সমস্যাই এখন আমাদের বৃহত্তম সমস্যা।

স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথে যে সাতটি বছর পার হইয়া

আসিয়াছি, তাহার উপর সংক্ষেপে আমরা চোখ বুলাইয়া লইয়াছি। এখন একবার মাথা তুলিয়া ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাইতেছে। ভবিষ্যৎ অজানা সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া ভয় ও ভাবনাকে প্রশ্রয় দিবারও কোন যুক্তি নাই। বিরাট এই ভারত ভূভাগ, বিরাট তাহার জনসমাজ, ভয়ের ভাবনায় তো কিছু দেখিনা! অমিত প্রাণ এবং অপূর্ব সংরক্ষণশক্তি এই প্রাচীন জাতির মজ্জায় সঞ্চিত আছে। পৃথিবীর ইতিহাসে কত সভ্যতা আসিয়াছে, আবার নদীর ঢেউয়ের মত মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের সমাজ ও সভ্যতা নদীর ঢেউয়ের মত উত্থান ও পতনশীল না হইয়া নদীর মতই গতিধর্ম লইয়া আজও অব্যাহত রহিয়াছে। কোন জাতিরই অস্তিত্বের মধ্যে এই প্রাণ ও সংরক্ষণ শক্তিটুকু পরিলক্ষিত হয় না, মানব-ইতিহাসে এই ভারতবর্ষই এক পরম বিস্ময়। ভবিষ্যৎকে ভয় করিবার সে জাতির তো কোন কারণই নাই, এই বিশ্বাস যাহার মর্মমূলে রহিয়াছে, সেই প্রকৃত ভারতবাসী। তাই ভবিষ্যতের পানে মাথা তুলিয়া অকম্পিত কণ্ঠেই স্বাধীন ভারতের পূণ্য জন্মদিবসের দ্বারে দাঁড়াইয়া শুনাইতে ও শুনিতে চাহি—নিজের বল ছাড়া বল নাই। ভারতবর্ষ যেখানে নিজবলে প্রবল, সেই স্থানটি যদি আমরা আবিস্কার করিতে পারি, তবে মহাপ্রলয়েও আমাদের ক্ষয় নাই, কোন ভয়ই আমাদের কাছে ভয়ানক নয় এবং কোন ভবিষ্যৎই আমাদের দৃষ্টিতে অস্বীকার নয়।—জয় ভারত ভাগ্যবিধাতা॥

দৈনিক বসুমতী

স্বাধীনতা দিবস

আজ স্বাধীনতার অষ্টম বর্ষের প্রথম প্রভাতে সর্বাগ্রে তাঁহাদিগকেই স্মরণ করিতেছি যাঁহারা ফাঁসিমঞ্চে, সম্মুখ সঙ্ঘর্ষে ও

পুলিসের গুলীতে প্রাণ দিয়া এবং দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আমাদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী করিয়াছেন। আমাদের স্বাধীনতা দিবসের একটি বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের পূত জন্মদিবসে আমরা বৃটিশের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছি। এই ঘটনার তাৎপর্য্যও আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন। শ্রীঅরবিন্দের প্রেরণাই একদিন ভারতের তরুণদলকে বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার কোন সংযোগ ছিল না, কিন্তু তাঁহার সাধনাদীপ্ত অমোঘ ইচ্ছা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্ভেদ্য সহায়ে পরিণত হইয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা দিবস এবং তাঁহার শুভ-জন্মতিথিতে তাঁহার অম্লান স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি। দেখিতে দেখিতে সাত বৎসর কাটিয়া গেল, আমরা বৃটিশের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছি। ভারত বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও দেশবাসীর মনে আশা জাগিয়াছিল, স্বাধীন ভারতে আমাদের অন্নবস্ত্রের অভাব দূর হইবে, মাথা গুঁজিবার একটু স্থান মিলিবে, ঔষধ ও পথ্যের অভাবে মরিতে হইবে না, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষার হইবে সুব্যবস্থা। কিন্তু স্বাধীনতার সাত বৎসর এই আশার একটুকুও পূরণ হয় নাই। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিলোপ, কঠোর প্রেস আইন, বিনা বিচারে আটক আইন প্রভৃতির কাঁটাতারের বেড়া দিয়া ভারতবর্ষের শাষকবর্গ যে ভাবে স্বাধীনতাকে লালন-পালন করিতেছেন, তাহাতে স্বাধীনতা কোনদিন যে দেশবাসীর এই আশা পূরণ করিতে পারিবে, সে সম্বন্ধেও ভরসা করা কঠিন।

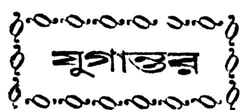
স্বাধীনতার সাত বৎসরে এতবার পুলিশের গুলী চালিয়েছে যাহার হিসাব করিতে গেলে একটি দীর্ঘ তালিকা হইবে। ভূখা মিছিলের উপর গুলী চলিয়াছে, ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ আন্দোলনের মিছিলের উপর গুলী চলিয়াছে, গুলী চলিয়াছে শিক্ষক

ধর্মঘট উপলক্ষে মিছিলের উপর, ছাত্রদের মিছিলের উপর। পুলিশের গুলীতে নারীহত্যা পর্যন্ত হইয়াছে স্বাধীন ভারতে। শাসনতন্ত্রে ছিটাফোঁটা ব্যক্তি স্বাধীনতা যাহা ছিল তাহাও বিলোপ করা হইয়াছে। কংগ্রেস ধূয়া তুলিয়াছে ইয়েলো জার্ণালিজম দমনের অজুহাতে পুনরায় শাসনতন্ত্র সংশোধন করিবার। স্বাধীনতার অষ্টম বৎসরেই হয়ত শাসকশ্রেণীর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। স্বাধীনতার সপ্তম বৎসর সর্বপ্রথম ভাষাভিত্তিক রাজ্য হিসাবে অন্ধ্ররাজ্য গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু রামুলুর আত্মত্যাগে বিপুল বিক্ষোভ সৃষ্টি হওয়ার ফলেই উহা সম্ভব হইয়াছে মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। সপ্তম বৎসরেই রাজ্য পুণর্গঠন কমিশন গঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার পরিণাম সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই দেখা যাইতেছে না। প্রেস কমিশনের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বার্তাজীবীদের কিছু সুবিধা দিবার সুপারিশ আছে বটে, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হওয়ার ভরসা খুব কম। কিন্তু উহাতে প্রেস আইন সংক্রান্ত যে সকল সুপারিশ আছে সেগুলি কার্য্যে পরিণত হইলে সংবাদপত্র দমনের নূতন অস্ত্র তৈয়ারী হইবে। ফৌজদারী আইন যে ভাবে সংশোধন করার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে সুবিচার হওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। স্বাধীনতার সপ্তম বৎসরে আমাদের খাদ্যাভাব দূর হইয়াছে ইহা অবশ্যই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু খাদ্যাভাব দূর হওয়ার জন্য আমাদের শাসকবর্গের কোন কৃতিত্ব নাই। খাদ্যের ঘাটতি আমাদের কোনদিন ছিল না। রেশন ব্যবস্থাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাল বাঁচাইয়া রাখার ফলে সৃষ্টি হইয়াছে কৃত্রিম ঘাটতির। রেশন ব্যবস্থা উঠিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের খাদ্যাভাবও দূর হইয়াছে।

স্বাধীনতার সপ্তম বৎসরে ভারতে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথচ এই বৎসরেই আরম্ভ হইয়াছে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসর। এই পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। পার্লামেণ্টে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সম্পর্কে

বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু যেভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বেকার সমস্যার অতি নগণ্য অংশেরও সমাধান হইবে না। অথচ এদিকে নিত্যনূতন বেকার সৃষ্টি হইতেছে। মিশ্র অর্থনীতি যে বন্ধ্যা, বেসরকারী শিল্পে প্রয়োজনীয় মূলধন নিয়োগ না হওয়া, উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না হওয়া এবং মূল্য বৃদ্ধি অব্যাহত থাকা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এখন বলিতেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গঠনের আয়োজন। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের এখনও কিছুই হয় নাই। অথচ পাসপোর্ট প্রবর্ত্তিত হওয়ার পরেও উদ্বাস্তুর আগমণ অব্যাহত রহিয়াছে। কংগ্রেসী শাসকবর্গ ভারতে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছে, রাজনৈতিক স্বাধীনতায় পরিবর্ত্তন করার পরিবর্ত্তে ব্যক্তি স্বাধীনতা লোপের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জনগণের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ব্যবস্থা দূরে থাকুক তাহাদের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থাও তাঁহারা করিতে পারেন নাই। তাই শসকশ্রেণী ছাড়া স্বাধীনতা দিবসে আনন্দ করিবার মত উৎসাহ কাহারও নাই। স্বাধীনতা দিবসের আগমনে জনগণের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে না। শাসকবর্গ জনগণ হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থান করেন। জনগণের অবস্থার সহিত তাহাদের কোন পরিচয় নাই। তবু স্বাধীনতা দিবসের সার্থকতা আছে। আমরা বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি। স্বাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় আমাদের সংগ্রাম করিতে হইবে! রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সংকল্প গ্রহণই হউক আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালনের প্রধান লক্ষ্য।

বন্দেমাতরম্, জয় হিন্দ !!



১৫ই আগস্ট

আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যে দিন সবার বড়, দুইশত বৎসরের পরাধীনতার বন্ধন ছেদন করিয়া যেদিন ভারতবর্ষ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিশ্বসভায় প্রথম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই ১৫ই আগস্টের শুভপ্রভাতে আজ আমরা জাতীয় পতাকাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করিতেছি। বিগত দিনের নায়ক, সাধক ও সৈনিকের জীবনব্যাপী শ্রম এবং দুঃখ বরণের বিনিময়ে যে স্বাধীনতা আমরা লাভ করিয়াছি, তাহা আমাদের জীবনে সুন্দরতর, সার্থকতর ভবিষ্যতের দ্যোতক হউক। দুঃখ দারিদ্র, অভাব অশিক্ষা, আধিব্যাধি সব কিছু হইতে মুক্ত হইয়া ভারতবর্ষ বিশ্বের উন্নতিশীল দেশগুলির সঙ্গে একতালে পা ফেলিয়া চলুক। জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প বানিজ্যে প্রতিটি মানুষ সমৃদ্ধ হউক—দেশ ও জাতিকে তাহারা গৌরবান্বিত করিয়া তুলুক, নিজের গণ্ডীর বাহিরে যে বৃহৎ পৃথিবী ও তাহার বিচিত্র মানব গোষ্ঠী রহিয়াছে তাহার প্রতিও সমুচিত কর্তব্য পালনে অগ্রণী হউক। বলা বাহুল্য, দুইশত বৎসর একটি শক্তিশালী বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অধীন থাকায় ভারতবর্ষ একদিকে শুধু কাঁচামালের জোগানদার, অন্য দিকে বিদেশী কারখানায় বানানো পণ্যের খরিদ্দার হইয়া থাকিয়াছে। তাহার নিজস্ব শিল্পবাণিজ্য কলকারখানা কিছুই যুগের অনুযায়ী ধারায় গরিয়া উঠে নাই। ফলে সারা দেশ দারিদ্র ও অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়া থাকিয়াছে, আর সেই অন্ধকারের সমুদ্রে ভাসমান দ্বীপের মতো

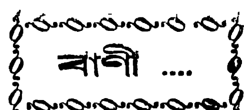
কয়েকটি নগর ও বন্দর শুধু বিদেশী সাম্রাজ্য এবং বানিজ্যের চলাচলে সহায়তা করিয়াছে। এই ভুমিকার উপরই হঠাৎ একদিন স্বাধীনতা স্থানান্তরিত হইয়াছে—কাজেই সমস্ত দুঃখ দারিদ্র ও সঙ্কট সমস্যা সঙ্গে লইয়াই স্বাধীনতা দেশবাসীর হাতে আসিয়াছে। উপরন্তু স্বাধীনতার মূল স্বরূপ ভারতের পূর্ব পশ্চিমের দুই বৃহৎ ভূখণ্ড খোদ মাতৃভুমির মৃত্তিকা হইতে বিসর্জন দিতে হইয়াছে—আর সেই বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড লইয়া গঠিত ঐশ্লামিক রাষ্ট্র যে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপদ্রবের কারণ স্বরূপও হইয়াছে, ইহা কে না জানেন? কজেই স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সমৃদ্ধি স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিতে মানুষের জীবন ভরিয়া ওঠে নাই। বরং নানা বিঘ্ন বিপদ ও জটিলতাই দেখা দিয়াছে। যাহারা আশা করিয়াছিল, স্বাধীনতা আসিলেই সব সমস্যা সূর্যোদয়ের কুয়াসার মত ভাসিয়া যাইবে, তাহারা তাই স্বাধীনতার উপরই ক্রমশঃ যেন অপ্রসন্ন হইতে শুরু করিয়াছে। এই অসন্তোষ সর্বপ্রয়ত্নে দূর করার জন্য গভর্ণমেণ্টকেও যেমন সচেস্ট হইতে হইবে দেশবাশীকেও তেমনি শ্রম, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় সহকারে দুঃখ জয়ের সাধনায় ব্রতী হইতে হইবে। বহুদিনের ব্যাধি দুই দিনে দূর হইবে কি করিয়া?

কিন্তু দুঃখ দুর্দশা, অভাব, অনটন সবকিছু সত্বেও আমরা যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি বিশাল ভারতভূমি তাহার সুপ্রাচীন সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিরাট ঐতিহ্য লইয়াও বিশ্বে কাহারো কাছে মুখ তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে নাই—রাজনৈতিক পরাধীনতাই তাহার সকল গরিমা হরণ করিয়া লইয়াছে। আজ সেই ভারতই আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় কত বড় দায়িত্ব জনক ভূমিকা লইয়াছে, কোরিয়া ও ইন্দোচীনের ঘটনায় তাহা স-প্রমাণ হইয়াছে। টিউনেসিয়া, কেনিয়া, বৃটিশ, গায়না, সকলেই আজ ভারতের দিকে তাকাইয়া আছে—ইংলণ্ড, ফ্রান্স, চীন, রাশিয়া, আমেরিকা সকলেই আজ ভারতের মত ও পথকে সসম্মানে স্বীকার করিতেছে। বিশ্বশান্তি ও মানব কল্যাণে ভারত যে আজ এত বড় ভূমিকা লইতে সমর্থ হইবে, ইহা কি আমরা আগে ভাবিতে

পারিয়াছিলাম? স্বাধীনতার এই সুমহৎ দানকে যেন আমরা যোগ্য মর্যাদায় গ্রহণ করিতে ভুল না করি। কিন্তু শুধু বাহিরেই নয়, ভিতরেও স্বাধীনতার শুভঙ্কর ফল আমরা ইচ্ছা করিলেই লক্ষ্য করিতে পারি। আমাদের জাতীয় সাহিত্য শিল্প ও জ্ঞান বিজ্ঞানকে যে আজ আমরা সমুচিত নিষ্ঠায় যে সেবা করার সুযোগ পাইয়াছি, আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠানকে যে আমরা যোগ্য গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছি, ইহাও স্বাধীনতারই আশীর্বাদ স্বরূপ। সেচ, সার, ও বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং কৃষি ও শিল্পবানিজ্য সম্প্রসারণের যে সব বৃহৎ উদ্যম শুরু হইয়াছে, যে সমস্ত উন্নয়ণ মূলক পরিচালনায় হাত দেওয়া হইয়াছে, নগর, পত্তন, গ্রাম, সংস্কার ও উদবাস্তু পুণর্বসতির যে সব উদ্যোগ চলিতেছে. তাহা প্রয়োজনের অনুপাতে পর্যাপ্ত নয়। তবু নগণ্যও নয়। সমগ্র পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ লইলে যে মানুষের অনেকটা দুঃখ দূর হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ। তথাপি শিক্ষা বিস্তার, বেকার সমস্যাবিদূরণ, স্বাস্থ্যোন্নয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে ক্ষিপ্রতর এবং রূপ-কতর আয়োজন করার আবশ্যকতা আছে এবং তাহা করার দ্বারাই যে মানুষকে স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদে অভ্যস্ত করা যাইবে, ইহা বলাই নিস্প্রয়োজন। স্বাধীন ভারতে আজ যখন আমরা স্বাধীনতার অষ্টমবার্ষিক উৎসবে ব্যাপৃত হইয়াছি, তখন এই কথাটাই যে আমাদের মনের পুরোভাগে জাগরূক থাকে যে, মানুষের জন্যই স্বাধীনতা—অন্নে-বস্ত্রে, শিক্ষায়-স্বাস্থ্যে, জীবিকায়, ব্যবসা-বানিজ্যে—মানুষকে উন্নত, বলিষ্ঠ, সচ্ছল ও সমৃদ্ধ করিয়াই স্বাধীনতাকে তাহার সত্যকার রূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। শুধু আমোদ-প্রমোদে, বাজী-বজনা, আলোকমালা গীতবাদ্যের অনুষ্ঠানে মাতিয়াই যে আমরা স্বাধীনতার সেই বৃহত্তম লক্ষ্য-বস্তুটি বিস্মৃত না হই—প্রতি বৎসরের স্বাধীনতা দিবস আমাদের জাতীয় জীবনে যে নূতনতর, বৃহত্তর ও উজ্জ্বলতর সাফল্যের ইতিবৃত্ত তুলিয়া ধরে; বরন্তে পূর্বাচার্য্যদের তপস্যা ও

আমাদের শ্রম একত্র যুক্ত হইয়া ভারতকে মহাভারতে রূপান্তরিত করুক।

জয়হিন্দ!



জাতি হিসাবে আমরা বীরের মত অনেক ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াছি।

কখনও যদি আমরা শ্রান্ত, ক্লান্ত এবং অবসন্ন হইয়া থাকি, তবে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। কারণ জীবন রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে নিদ্রা ও বিশ্রামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। চিন্তায় ও কার্যে মৌলিকতা ও সৃজনী শক্তিই জীবনের লক্ষ্য।

আমরা এখনও জীবিত আছি এবং জাতি গঠনের সকল উপাদানই আমাদের রহিয়াছে। সেইজন্য আজও আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতেছি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

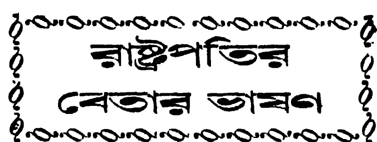
১৯৫৫

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী　শ্রীঅরবিন্দ

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি



স্বাধীন ভারতে জাতি গঠনে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—অদ্য রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্য প্রচারিত তাঁহার বাণীতে বলেন, "আমাদের অষ্টম বার্ষিকী স্বাধীনতা দিবসে আমি আমার সকল দেশবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। স্বাধীনতার পর হইতে গতকাল পর্যন্ত সাত বৎসর আমাদের নিকট বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সময়। কারণ, ঐ কয় বৎসর আমরা স্বদেশে পুনর্গঠন কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছি এবং বিদেশে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের নিজস্ব পন্থায় সাহায্য প্রদান করিয়াছি।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

ভারতের অংশ গোয়ায় বিদেশী আধিপত্য কল্পনার অতীত

নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী বর্ষণ সম্পর্কে হুঁসিয়ারী—

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, 'বিশ্বের কোন শক্তিই গোয়াকে ভারত হইতে পৃথক করিয়া রাখিতে পারে না। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর গোয়া কোন ইউরোপীয় শক্তির অধীনে থাকিবে তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করা যায় না।'

পর্তুগীজ সৈন্যগণ কর্তৃক নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলীবর্ষণের উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষকে এই বলিয়া হুঁসিয়ার করিয়া দেন যে, এই পন্থায় তাহারা কিছুই লাভ করিবে না। বিষয়টি বিশ্বের জনমতের দরবারে পেশ করিয়া বলেন, "কোন সরকার কিম্বা কোন রাষ্ট্র কর্তৃক নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ জনতার উপর গুলীবর্ষণ কতদূর সঙ্গত হইয়াছে তাহা আমাদের ও বিশ্বের সকলকে বিবেচনা করিতে হইবে।"

পি, টি, আই

স্বাধীনতা দিবস

আজি হইতে আট বৎসর পূর্বের এক পনরই আগস্টে ভারতীয় জাতির পরাধীনতার অবসান ঘটিয়াছিল। জাতীয় জীবনের সুদীর্ঘ কালের আকাঙ্খা ও সংগ্রামের ঐতিহাসিক পরিণতিরূপে রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার লাভ করিয়া জাতির চিত্ত প্রসন্ন হইয়াছিল। প্রসন্নতা স্বাভাবিক ভাবেই জাতীয় উৎসবের রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। পনরই আগস্ট ভারতের ঘটনাবহুল ইতিহাসের এক পুন্যাহ। ইহা স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণ দিবস।

কিন্তু উৎসবে প্রসন্ন এই দিবসটিকে নিতান্তই স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণ দিবস বলিয়া মনে করিতে পারি না। স্বাধীনতার প্রাপ্তিতে জাতির মহত্তম অভীষ্ট লব্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনেও করি না। স্বাধীনতার প্রাপ্তি জাতীয় আকাঙ্খার পূর্ণতা প্রাপ্তির ঘটনা নহে। স্বাধীনতা লাভ করিয়া জাতি আর এক মহদভিলাষ স্বীকার করিবার দায়িত্ব লাভ করিয়াছে, জাতীয় জীবনকে মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য দান করিবার জন্য আর এক দুরূহতর কর্তব্যের সম্মুখীন হইয়াছে। সেই কারণে পনরই আগস্ট শুধু এক প্রাপ্তি স্মরণের দিবস নহে, উহা জাতীয় কর্তব্য উপলব্ধির দিবসও বটে।

আমরা স্বীকার করিব, স্বাধীনতা প্রাপ্তির স্মরণ দিবস পনরই আগস্টের উৎসবের মধ্যে এই উপলব্ধির ও অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। জাতীয় সংগঠনের এবং জনসমৃদ্ধি রচনার আশা রাষ্ট্রীয়-পরিচালনার

প্রধানদিগের ভাষণে ঘোষিত হইয়া থাকে। দেশবাসীর আর এক সত্য স্মরণ করিবার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নহে। এই পথেও বিপুল দুরূহতা আছে, সঙ্কট আছে, পরীক্ষা আছে। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতাকে জাতীয় সমৃদ্ধি সাধনে স্বার্থক করিতে হইলে সমস্যার সহিত যে সংগ্রাম করিতে হইবে তাহা স্বাধীনতা সংগ্রামের তুলনায় কম নিষ্ঠা, প্রয়াস ও সৎসাহসের দ্বারা সফলীভূত হইবার নহে।

স্নতরাং পনরই আগস্টের উৎসবের মধ্যে বিশেষভাবে এই সত্যই স্মরণ করিবার প্রয়োজন আছে যে, এই দিবসটি জাতির পক্ষে বস্তুত একটি বৃহৎ পরীক্ষার—তাৎপর্য এবং গুরুত্ব স্বীকার করিবার দিবস। আমরা চাহিব, ভারতের জনসাধারণ নিতান্ত প্রশ্নহীন চিত্তের উল্লাস লইয়া পনরই আগস্টের গুরুত্ব অনুভব করিবে না। আমরা চাহিব, এই দিনে জনসাধারণের মনে এই জিজ্ঞাসাই প্রবল হইয়া উঠুক, বিগত আট বৎসরের মধ্যে জাতি কোন্ নূতন অভীষ্ট লাভ করিল? শুধু এই প্রশ্নই নহে, বৃহত্তর কোন অভীষ্টের দিকে জাতি সত্যই অগ্রসর হইতে পারিতেছে কিনা, ইহাও পনরই আগস্টের জিজ্ঞাসা। জনসাধারণের চিত্তে আমরা এই বাস্তব সম্মত অথচ মহৎ এক কৌতূহলের আবির্ভাব কামনা করি, রাষ্ট্রপরিচালকেরা জাতিকে কোন অভীষ্টের দিকে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন এবং বিগত আট বৎসরের মধ্যে সেই অভীষ্টের পথে জাতিকে কতদূর অগ্রসর করিতে পারিয়াছেন? পনরই আগস্টের আনুষ্ঠানিক উৎসবের মধ্যে যদি এই জিজ্ঞাসার প্রকাশ উৎসাহিত না হয়, তবে সে উৎসব জাতির যথার্থ প্রাণবত্তার প্রকাশ হইয়া উঠিতে পারে না।

বিগত আট বৎসরের মধ্যে জাতি যে বহুক্ষেত্রে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। দেশের সরকার বহুক্ষেত্রে অক্ষমতা ও অকৃতিত্বের পরিচয় দিয়াও জাতির উন্নয়নের এবং প্রয়োজনের বহুক্ষেত্রে অনেক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, যাহা জাতির চিত্তে আত্মশক্তিবোধ জাগ্রত করিয়াছে। দেশের সরকারের পক্ষে গৌরবের বিষয় এই যে,

তাঁহারা যে কোন পরিকল্পিত উন্নয়নী উদ্যোগে জনসাধারণের সহযোগিতা পাইয়াছেন। স্বাধীন ভারত এবং স্বাধীন ভারতের সরকার যে দুইটি প্রধান কারণে বিশ্বের জনমতে সম্মানার্হ হইয়াছেন তাহা হইল ভারতের পররাষ্ট্র নীতির শান্তি সহায়ক শক্তি এবং ভারতীয় জনসাধারণের সহযোগিতা অর্জন। ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা যে জাতীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক শক্তিরূপে সফল হইয়াছে, তাহা বিগত আট বৎসরের ভারতীয় জীবনের ঐ দুই কৃতিত্বই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু সরকারের ও জাতির এই কৃতিত্বের মধ্যে যে উন্নতির পরিচয় পাই, তাহাকে জাতীয় প্রকৃতির উন্নতি বলিলেই বোধ হয় যথার্থ এবং মাত্রাসম্মত উক্তি বলা হয়। জাতীয় উন্নতি বিচারের শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নির্ণায়ক হইল সাধারণ মানুষের উন্নতির স্বরূপ পনরই আগস্টের পুণ্যাহে বিগত আট বৎসরের সরকারী এবং জাতীয় কৃতিত্বের সকল গৌরব স্বীকার করিয়া এবং গর্ব অনুভব করিয়াও আমরা বিশেষভাবে এই প্রশ্নটিকেই স্মরণ করিতেছি, সাধারণ মানুষের উন্নতি কতটুকু হইয়াছে? সাধারণ মানুষের মনে আত্মমর্যাদা ও স্বাধিকারের বোধ কতখানি উন্নত ও সত্য হইয়াছে? বিগত আট বৎসরের বৈষয়িক উন্নয়নের প্রসন্নতা ও আনন্দের ভাগ সাধারণ মানুষ কি পরিমাণ লাভ করিয়াছে?

জাতির সংবিধান কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য পোষণ করিতেছে। বিগত বৎসরের স্বাধীনতা দিবসের পর দেশের সরকার এবং বৃহত্তম রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের চিন্তায় আর এক নূতন ঘোষণার সুস্পস্ট এক আদর্শবাদ অভিব্যক্ত হইয়াছে—সমাজবাদী প্রকারের সমাজ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই বিগত এক বৎসরের মধ্যে জাতীয় চিন্তার মধ্যে একটি নূতনত্বের ঘটনা। অন্য আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা হইল ফরাসীর অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরী মাহে করাইকল ও ইয়ানামের ভারতভুক্তি। চিন্তায়, উদ্যোগে এবং ঘটনায় যে কোন অভিনবত্ব লক্ষিত হউক না কেন, জাতীয় উন্নতির সত্যতা বিচারের

একমাত্র মানদণ্ড হইল সাধারণ মানুষের সুযোগ, স্বাচ্ছন্দ্য, অধিকার, সম্মান ও বৈষয়িক উন্নতির স্বরূপ।

পনরই আগস্টের হর্ষাকুল উৎসবের মধ্যে আমরা ভারতের সাধারণ মানুষের মুখের দিকে তাকাইয়া জাতীয় উন্নয়নের স্বরূপ বুঝিতে চাহিতেছি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়ায় সাধারণের উন্নয়ণ, সাধারণের আকাঙ্খা প্রস্তাবিত হইয়াছে। আর পাঁচ বৎসরে মাথা-পিছু গড় পড়তা উপার্জনের হার দ্বি-গুণিত করা হইবে। এবং আর পনের বৎসরের মধ্যে বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করা হইবে। সমাজবাদী আদর্শের আভাস পাইতেছি এবং এই ইচ্ছার সাফল্যও কামনা করি। এই লক্ষ্য লব্ধ হইলে পনরই আগস্টের একটি জিজ্ঞাসারও অবসান হইবে। কিন্তু ভারতের জন-জীবনে গণতন্ত্র সত্য হইয়াছে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সেই উদার সমন্বয়ের আদর্শ অর্থাৎ বহুতা, বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও প্রসন্ন হইবার জন্য এখনো আমরা ভবিষ্যতেরই এক পনরই আগস্টের প্রতীক্ষায় থাকিব। ভারতের সাধারণ মানুষ সুখী হইয়া অদূর ভবিষ্যতের এক পনরই আগস্টের উৎসবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবে, ইহাই আমাদিগের আজিকার স্বাধীনতা দিবসের স্বপ্ন।

দৈনিক বসুমতী

১৫ই আগস্ট

আজ পনেরোই আগস্ট। ১৯৪৭ সালের পর হইতে প্রতি বছরই এই দিনটি একটি বিশেষ তাৎপর্য্য লইয়া আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। যে স্বাধীনতা আমরা চাহিয়াছিলাম, যে স্বাধীনতার

জন্য বহু দেশপ্রেমিক জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন, অসংখ্য নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা হাসিমুখে উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন —সে স্বাধীনতা আমরা সম্পূর্ণ ভাবে পাই নাই সত্য। যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন আমরা দেখিতাম, সে স্বপ্ন পরিপূর্ণ সফল হয় নাই। তবু এই দিনটিতেই ভারতবাসী দেশের বিরাট অংশে বিদেশী অধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন, নিজেদের ভাগ্য নিজেদের হাতে গড়িয়া তুলিবার অধিকার অর্জন করিয়াছিলেন। তাই পনেরোই আগস্ট স্মরণীয় এবং বরণীয়।

কিন্তু এদিন শুধু উৎসব আর আনন্দের দিন নয়। আত্মানুসন্ধানেরও দিন। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই স্বরাজ ও স্বাধিকারের শেষ কথা নয় ;—উহা একটা ধাপ, একটা পদক্ষেপ মাত্র। দেশের অগণিত দরিদ্র, অনশন-ক্লিস্ট, অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থানহীন মানুষের মুখে হাসি ফুটাইবার জন্য, তাহাদের একটু মাথা গুঁজিবার দিবার জন্যই আমরা চাহিয়াছিলাম স্বাধীনতা। বিদেশী অধীনতাই ছিল এ সপ্ন সার্থক করার পথে বড় বাধা! সে বাধা দূর হইয়াছে। সুতরাং আসল লক্ষ্যে আমরা কতটুকু পৌঁছিয়াছি, পৌঁছাইতে পারিয়াছি এবং পৌঁছাইবার চেস্টা করিয়াছি, তাহা আজ বিচার করিবার উপযুক্ত সময়। জনগণের আর্থিক স্বাধীনতা ভিন্ন রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে অর্থহীন এ সত্য আজ আমরা উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাই জনগণের সেই আর্থিক স্বাধীনতাকে কিভাবে কত শীঘ্র কার্য্যের রূপ দেওয়া যায়, তাহাই আজ দেশের সামনে বড় সমস্যা। এই সমস্যা রাষ্ট্রনেতারাও ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বড় বড় পরিকল্পনারও কথা উঠিয়াছে। কিন্তু সমস্যা সমাধান করিতে যে দ্রুত গতি প্রয়োজন, যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা প্রয়োজন, যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ প্রবৃত্তি প্রয়োজন—তাহা কি আজও দেখা যাইতেছে?

আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে আর একটি বিশেষ সমস্যাদেশের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের একাংশ যে আজও বিদেশী

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে রহিয়াছে—সেখানকার অধিবাসীরা যে নিষ্ঠুর অত্যাচার নিপীড়ন ভোগ করিতেছে, স্বাধীনতা দিবসে সে-কথা ভুলিতে চাহিলেও ভুলিয়া যাওয়া সম্ভব নয়। আজ হইতে গোয়াতে ব্যাপক গণ-সত্যাগ্রহ শুরু হইতেছে। পর্তুগীজ শাসনের অস্তিত্ব ভারতের মাটি হইতে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করিতে না পারিলে আমাদের স্বাধীনতা কখনই পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে না। ভারত স্বাধীনতা লাভের নয় বছর পরেও পর্তুগীজ উপনিবেশ গুলির অস্তিত্ব নিতান্তই কলংক স্বরূপ কিন্তু দুঃখের ও লজ্জার কথা স্বাধীন ভারতের কর্মকর্তারা এই পর শাসনের অবসান ঘেটাইবার জন্য এ পর্য্যন্ত কার্য্যকারী কিছুই করিলেন না। নিরস্ত্র শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের রক্তে ভারত-ভূমি রক্তরঞ্জিত হওয়া সত্বেও তাহাদের গা ঘামে নাই। এমন কি সত্যাগ্রহীরা যাহাতে গোয়া সীমান্তে গিয়া হাজির হইতে না পারেন, তাহার চেষ্টা সরকারীভাবে চলিতেছে। তাঁহাদের যানবাহন ব্যবহারে সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই। বোম্বাই সরকার সত্যাগ্রহীদের লরী ব্যবহার করা চলিবে না বলিয়া যে আদেশ দিয়াছেন তাহা স্বাধীন দেশের গভর্ণমেন্টের পক্ষে কলঙ্কেরই কথা। এই আদেশ পর্তুগীজ কর্ত্তাদেরই সাহায্য করার নামান্তর। স্বাধীনতা দিবসে তাই সর্বত্রই দাবী উঠা প্রয়োজন—গোয়া সম্বন্ধে ভারত সরকারের ক্লীব নীতি পরিত্যাগ হোক। ভারতের মাটি হইতে সাম্রাজ্যবাদের শেষ চিহ্ন লুপ্ত করিতে ভারত সরকার ও জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

যুগান্তর

১৫ই আগস্ট

ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে ১৫ই আগস্ট একটি নূতন যুগারম্ভের মত। দীর্ঘ ১৭০ বৎসরের বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনেরই

অবসান ঐ দিনে ঘটে নাই, প্রকৃত পক্ষে বহু শতাব্দীর পর ভারতবর্ষ বৈদেশিক আক্রমণ, শাসন ও পীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করে। একথা বলাবাহুল্য যে, এই মুক্তির জন্য ভারতবর্ষকে প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করে, লাঞ্ছনা বরণ ও সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। বহু রক্তপাত ও অশ্রুর ভিতর দিয়া ভারতীয় জনসাধারণকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে গৃহীত স্বাধীনতার আইন অনুসারে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা অর্পণের ও বৃটিশ শাসন অবসানের চুক্তি পত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা এক নূতন যুগের উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এভাবে ভারত সাম্রাজ্যকে আপোষ রফার দ্বারা স্বাধীনতা অর্পণ বৃটিশ ঔপনিবেশিক ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা এবং এই নূতন ঘটনার দৃষ্টান্ত এশিয়া খণ্ডে অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপরেও প্রভূত বিস্তার করিয়াছিল। ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানের পর এই পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও অনুরূপ নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির উপরও ক্রমশঃ কার্যকরী হইয়াছে কিংবা হইতেছে। কিন্তু ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অনুন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহা হইতেছে নিরস্ত্র জনসাধারণ কর্তৃক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই দিক দিয়া পৃথিবীর জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অভিনব ও বিস্ময়কর বস্তু। "দারিদ্র ও মুর্থ ও অজ্ঞ ভারতবাসী" যে ভাবে অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল, যে ভাবে অহিংস প্রতিরোধের দ্বারা বার বার বৃটিশ রাজ শক্তিকে বিব্রত ও বিপন্ন করিয়াছিল, তার তুলনা খুব বিরল। আত্মিক শক্তির নৈতিকতা ও রাজনৈতিক চেতনার সাহসিকতা মিলিয়া ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ শহরবাসী ও গ্রামবাসীকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল। অবশ্য কংগ্রেসের অর্ধ-শতাব্দী ব্যাপী আন্দোলনের পশ্চাতে বাংলার [স্বদেশী যুগ ও সন্ত্রাসবাদের দুঃসাহসিকতা এবং রাজ্যশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে চরম

আত্মত্যাগের মধ্যে দুর্দমনীয়তা সারা ভারতবর্ষে বিপুল প্রেরণা আনিয়াছিল। উহারও আগে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ এবং বাংলা দেশের নানা অংশের কৃষকদের বিদ্রোহ ও নীলকর প্রতিরোধ উণবিংশ শতকের জন-জীবনকেও প্রচণ্ড নাড়া দিয়াছিল। অর্থাৎ ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের বৃহত্তর ও গভীরতর পটভূমি রচনায় সিপাহী, মজুত, কৃষক, ও কারিগর শ্রেণীর দানও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এমনকি কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনেও এই শ্রেণী সাহসের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে, মাঠে মাঠে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু "শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের" রচিত ইতিহাসে এই কৃষক, কারিগর ও মজুর শ্রেণীর সংগ্রাম ও ত্যাগ তেমন মর্যাদা পায় না, যেমন মর্যাদা পায় ইংরাজিজানা মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর ত্যাগ স্বীকার ও আন্দোলন। আজ ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-দিবসে ভারতবর্ষের সেই মুক্ত জনসাধারণকে নূতন করিয়া স্মরণ করা দরকার।

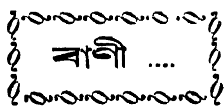
জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষে বৃটিশ-রাজ-শাসনকে একান্ত দুর্বল এবং উহার নৈতিক শক্তিকে হীনবল করিয়াছে, সন্দেহ নাই। তথাপি ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়ার ফলে একদিকে বৃটিশ সম্রাজ্যশক্তির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল এবং অন্যদিকে এশিয়া মহাদেশে জনসাধারণের জাতীয় চেতনা বিপ্লবমুখী হইয়া উঠিল, এই বিপ্লবমুখী মনোভাবের পিছনে রহিয়াছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্ত্তী সোভিয়েট বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির ঘাত-প্রতিঘাত এবং শ্রমজীবি মানুষের নূতন মর্যাদাবোধ। এই সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে আজাদ হিন্দ ফৌজের বলিষ্ঠ বাহুর দ্বারা যে দুঃসাহসিক আঘাত হানিয়াছিলেন, তাহাই অনতিবিলম্বে ১৯৪৬-৪৭ সালে ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীর, কলিকাতার রাজপথ এবং

মাদ্রাজ ও বিহারের বিভিন্ন অঞ্চল পুলিশ, সৈন্য ও জনগণের স্পর্দ্ধিত বিদ্রোহে মুখর হইয়া উঠে। ইহার পরেও যদি বৃটেনের লেবর-গভর্ণমেণ্ট, অর্থাৎ মিঃ এটলীর দল ভারতীয় কংগ্রেস ও মুস্‌লিম লীগের সঙ্গে আপোষ মূলক স্বাধীনতার ভাগ বাঁটোয়ারা না করিতেন, তবে, হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খৃষ্টান-বৌদ্ধ নির্ব্বিশেষে উদ্বেলিত জনতার বিপুল বন্যা তরঙ্গে বৃটিশ রাজত্ব নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ বণিক বৃত্তির অস্তিত্ব থাকিত না। কিন্তু কূটনীতিতে ইংরাজ পারদর্শী, বাস্তব বুদ্ধি তাহার প্রখর, সুতরাং ইংরাজ বুঝিল রাজনৈতিক "তাম্বু গুটাইবার" দিন আসিয়াছে। অবএব নীল-রক্তের অধিকারী এবং রাজবংশের গৌরবধারী লর্ড মাউণ্টব্যাটেন জিন্না ও জওহরলালকে বগলদাবা করিলেন—ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইল, কিন্তু দ্বিধা বিভক্ত ও ছিন্নাঙ্গ হইল, এই সাম্প্রাদায়িক অস্ত্রোপচারের জের আজও মিটে নাই। আজও পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ গৃহজীবনের অধিকার হইতে বঞ্চিত। সুতরাং স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের মধ্যে আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের এই বেদনাকে এবং সেই বেদনা প্রতিকারের দুরূহ কর্ত্তব্যকে যেন ভুলিয়া না যাই।

এবারের ১৫ই আগস্টের আর একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহা হইতেছে ভারতবর্ষের ভূমি হইতে বিদেশীর শেষ অধিকার নিশ্চিহ্ন করার অভিযান, এই দিন গোয়ার মুক্তি আন্দোলনে ভারতীয় জনগণ তাহাদের সত্যাগ্রহের শক্তিকে প্রয়োগ করিবেন। গত সাড়ে চারিশত বৎসর পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষের তীরভূমি আঁকড়াইয়া আছে। নিঃসন্দেহে স্বাধীন ভারতের পক্ষে ইহা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয়। এই পবিত্র ভারতবর্ষের সুচ্যগ্র ভূমিও আর বিদেশীর পদদলিত থাকা উচিত নয় এবং ক্ষুদ্র পর্তুগালের লোভ ও দুর্বুদ্ধিকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—একথা বলা-বাহুল্য মাত্র। পর্তুগীজ শাসকদের হৃদয় দুয়ারে গত কয়েক বৎসর বহু আবেদন নিবেদন করা হইয়াছে এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও

সৌভ্রাত্রের নীতি অনুসারে এ বিষয়ে মীমাংসার জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট বারবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কিন্তু পর্তুগীজ ফ্যাসীজম্ বন্দুকের ভয় দেখাইতেছে। এই বন্দুকের নীচে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ বুক পাতিয়া দেওয়ার মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। সুতরাং পর্তুগীজ উপনিবেশের মুক্তির জন্য ভারত-সন্তানগণ আজ পবিত্র সত্যাগ্রহের মহৎ অভিযানে যাত্রা করিবেন। তাঁহাদের এই পুণ্যব্রত সফল হোক—এই প্রার্থনা উঠিবে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে স্বাধীনতা উৎসবের মঙ্গল-শঙ্খের সঙ্গে।

আসুন, এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা আর একটি সঙ্কল্প গ্রহণ করি—যে জনসাধারণের তপস্যায় ভারতবর্ষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে, সেই জনগণকে যেন আমরা দারিদ্রের পীড়ন ও সামাজিক বৈষম্যের অত্যাচার হইতে মুক্তি দিতে এবং এক উন্নততর রাষ্ট্র ও কল্যাণ-দৃপ্ত জীবনের ভিত্তি রচনা করিতে পারি। জয়হিন্দ্!



……দেশের উপর একটা স্তব্ধতা এসে পড়েছে, সবাই যেন বিভ্রান্ত, কারণ আমাদের সামনে ভবিষ্যতের স্বপ্নে-পূর্ণ ভগবানের যে উজ্জ্বল স্বর্গ ছিল, তার পরিবর্তে মাথার উপর যেন এক মেঘার্বত আকাশ, সেখান থেকে বজ্র ও বিদ্যুৎ বর্ষিত হচ্ছে।

শ্রীঅরবিন্দ

১৯৫৬

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা

....

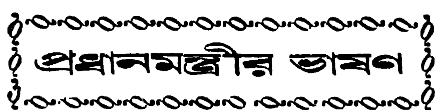
- বাণী স্বামী বিবেকানন্দ

রাষ্ট্রপতির
বেতার ভাষণ

দেশের বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টায় জাতীয় ঐক্য সাধনের আবেদন

কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র গঠনই ভারতের লক্ষ্য বলিয়া মন্তব্য

নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট—"জাতীয় ঐক্য সাধন ব্যতীত বাস্তব সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুধু যে ব্যাহত হইবে তাহাই নহে—উহা বিফল হইবে। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থে নয়, পরন্তু বৃহত্তর জাতীয় সার্থের খাতিরেই আমরা রাজ্য পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলাম, একথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।"



বলপ্রয়োগে সুয়েজ সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের আশঙ্কা

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতা লাভের নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দিল্লীর লালকেল্লা দুর্গপ্রাকার হইতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, "কোন শক্তি যদি ভুল ক্রমেও যুদ্ধ অথবা যুদ্ধের হুমকী দ্বারা সুয়েজ সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টা করে তবে উহার বিষময় ফল ফলিবে এবং পরিণামে যে যুদ্ধ বাধিবে তাহা বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হইতে পারে।"

ভারতের আভ্যন্তরীণ সমস্যা

তিনি বলেন, "আমি স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতে চাই যে, রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যাপারে সংসদের সিদ্ধান্ত আইনে পরিণত হইলে বল-প্রয়োগে অথবা হুমকী দিয়া উহা পরিবর্তন করা যাইবে না। ঐ আইন পরিবর্তনের গণতান্ত্রিক পন্থা রহিয়াছে, উহা পরিবর্তন করিতে হইলে সেই পথই ধরিতে হইবে, বলপ্রয়োগের পথে উহা পরিবর্তন করা যাইবে না।"

১৫ই আগস্ট

বৈদেশিক শাসনপাশ ছিন্ন করিয়া সমুন্নত মস্তকে স্বাধীন জাতিসমূহের আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইবার যে দুর্জয়-সঙ্কল্প জাতি একদা গ্রহণ করিয়াছিল, সাধনার পথে অগ্রসর হইতে গিয়া শত-সহস্র শহীদ জীবন দান করিয়াছে যে ব্রতের বেদীমূলে, লক্ষ কোটি নরনারী যাহার জন্য সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে শাসক শক্তির নির্মম নিপীড়ন—সে ব্রত উদ্‌যাপিত হয় আজিকার এই শুভ দিনে। পনরই আগস্ট তাই ভারতের জাতীয় দিন-পঞ্জীতে পুণ্যতম দিবস। কালচক্রের দুর্নিবার আবর্তন বেগে সেই পুণ্যাহ পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে আমাদের জীবনে। নগরে ও পল্লীতে তাই প্রতিবারের মত এবারেও এই দিনটি উদ্‌যাপিত হইবে জাতীয় উৎসব দিবসরূপে। ভবন চূড়ে চূড়ে উড্ডীন জাতীয় পতাকা প্রভাত-পবনে আন্দোলিত হইয়া তাহারই উদ্দেশে জ্ঞাপন করিবে স্বাগত সম্বর্ধনা, শঙ্খে শঙ্খে ধ্বনিয়া উঠিবে তাহারই সম্বর্ধনা-গান। জাতীয় আশা আকাঙ্খা যে দিনটির মধ্যে আপন চরিতার্থতা খুঁজিয়া পাইয়াছে, সমগ্র জাতির অন্তর শিহরিয়া ও সঞ্জীবিয়া উঠিবে তাহার ঐন্দ্রজালিক যাদুদণ্ডস্পর্শে।

সুখী, সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গড়িবার যে স্বপ্ন জাতি একদা দেখিয়াছিল, তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিবার পথে স্বাধীনতাই প্রথম সোপান। এ সোপানে পদার্পণ না করিয়া স্বপ্ন-সৌধের

স্তরবিন্যাস অতিক্রম করা অসম্ভব এবং তাহা না করিলে সৌধের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করার সাধ অপূর্ণই রহিয়া যাইবে। বৈদেশিক শাসনের যে জগদ্দল পাষাণভার জাতির অপরাজেয় প্রাণশক্তি, অদম্য কর্মক্ষমতা ও অনন্য সাধারণ প্রতিভার উৎস-মুখ রুদ্ধ করিয়া সার্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া বিরাজ করিতেছিল তাহা উৎক্ষিপ্ত হইবামাত্র সুপ্ত নির্ঝর ফিরিয়া পাইয়াছে তাহার অপগত আত্মসম্বিৎ, তাহার সারা দেহে জাগিয়া উঠিয়াছে আকুল জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাজিয়া উঠিয়াছে তাহার দ্রুত অথচ দৃঢ় পদক্ষেপ শব্দ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাজিয়া উঠিয়াছে—তাহার অমোঘ ও অনস্বীকার্য কণ্ঠস্বর। স্বাধীন ভারতের উদ্ভব ও উপস্থিতি বিশ্ব-সভার দরবারে নিজের অস্তিত্বের স্বাক্ষর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। সমগ্র বিশ্ব বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে পৃথিবীর রাজনৈতিক আকাশে তাহার নব অভ্যুদয় নিরীক্ষণ করিতেছে আর নির্বাক বিস্ময়ে ভাবিতেছে, যে কিশোর রবির কিরণ এত উজ্জ্বল ও প্রভাময়, মধ্য-গগনে আরোহণ করিলে না জানি সে কী মহিমায় মণ্ডিত হইবে!

ভারতীয় স্বাধীনতার যে প্রভাত সূর্যের আলো সিন্ধুপারে ও দূর গোলার্ধ অন্তরে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে নিজের ভৌগলিক সীমার অভ্যন্তরে আজও তাহা পরিপূর্ণ দীপ্তিতে প্রোজ্জ্বল হয়, আজও তাহার ভাস্বর অভ্যুদয়কে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে ভোরের কুয়াসাজাল। স্বাধীনতা জাতির করায়ত্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জনসাধারণ আজও পূর্ণভাবে তাহার অমৃত আস্বাদ লাভ করিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত, আজও তাহার অকুণ্ঠ আশীর্বাদ মুক্ত ধারায় ঝড়িয়া পড়ে নাই তাহাদের মাথার উপর। অভাব, অনটন ও অশিক্ষার অভিশাপে আজও যাহারা দগ্ধ হইতেছে, তাহাদের নিজের দাবী ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি তাহাদিগকে সচেতন করিতে হয়, তাহা হইলে স্বাধীনতাকে

অস্বীকার করিয়া তাহা করা কদাচ সম্ভব হইবে না। তাহা হওয়া একান্ত উচিত ছিল অথচ আজও হইয়া উঠে নাই। তাহা না হওয়ার দায়িত্ব যদি কাহারও উপর বর্তায়, তবে তাহা বর্তাইবে বর্তমান শাসন ব্যবস্থার উপর; শাসন ব্যবস্থার অক্ষমতার বোঝা স্বাধীনতার স্কন্ধে আরোপ করিয়া তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে সে কার্য কি জনসাধারণকে জাগ্রত ও প্রবুদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে? নূতন জীবন প্রভাতে স্বাধীনতার আলোকস্পর্শে যে জনতা জড়নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিতে চাহিতেছে—স্বাধীনতা আজও আসে নাই এই কথা তাহাদের কর্ণে গুঞ্জন করার অর্থ হইবে এই কথাই তাহাদের কর্ণে ধ্বনিয়া তোলা যে, এখনও পরাধীনতার অমা-রাত্রি প্রভাত হয় নাই, কাক-জ্যোছনাকে ভোরের আলো ভাবিয়া কেন শয্যাত্যাগ করিতে চাহিতেছ? ঘুমাও—ঘুমাও—গাঢ় নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিয়া বৈদেশিক দুঃশাসনের দুঃস্বপ্ন দেখ!

ঘুম পাড়ানো এই সম্মোহন সঙ্গীত না গাইয়া জাগরনোন্মুখ জনতার শিয়রে দাঁড়াইয়া নিবেদিত স্বাধীনতা-সূর্যের বন্দনা-গান বাজাইয়া তুলিতে হইবে; বলিতে হইবে, শতাব্দীর অলস-শয্যা হইতে জাগিয়া উঠিয়া ভোরের আলোক প্রত্যক্ষ কর, দেশের ও দশের অবস্থা, নিজেদের ন্যায্য দাবীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া স্কন্ধে তুলিয়া লও নিজেদের বহনীয় দায়িত্বের যথা নির্ধারিত অংশ; ভোরের যে কুয়াসা জাল আজও প্রভাত সূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে—সবল বাহুর তাড়নায় তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দাও! ভারতের স্বাধীনতা-রবি মেঘমুক্ত সূর্যের মত সমুদিত হোক বিপুল আলোক-সমারোহে! সার্থক হোক স্বাধীনতা, সফল হোক জাতির চিরপেক্ষিত স্বপ্ন, সত্য হোক জাতির সর্ব-স্বপন সাধনা!

বন্দেমাতরম্!

দৈনিক বসুমতী

১৫ই আগস্ট

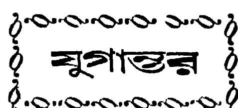
১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসের নূতন সমস্যা, নূতন সঙ্কট এবং প্রচুর আশাভঙ্গ জনিত হতাশা লইয়া আবার আসিয়াছে। প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস সরকারী কর্তারা খুব জাঁক-জমক করিয়া পালন করেন। জাতির জীবনে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের যে বিরাট তাৎপর্য্য রহিয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এদেশে স্বাধীনতা দিবস জনসাধারণের মনে আজ আর কোন উদ্দীপনা ও আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে না। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট সারা দেশে উৎসাহ ও উদ্দীপনার বান ডাকিয়াছিল। কিন্তু তারপর হইতে দিনে দিনে সে উৎসাহে ভাটা পরিতে শুরু করিয়াছে। এই অবস্থার কারণ কাহারও অজানা নাই। যে আশা ও স্বপ্ন লইয়া মানুষ স্বাধীনতার জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছিল, সে আশা মোটেই ফলবতী হয় নাই। বছরের পর বছর গিয়াছে, কিন্তু দেশের সাধারণ লোক যেই তিমিরে সেই তিমিরেই। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনেক প্রচারের ঢক্কানিনাদে দেশের লোকের কাছে উপস্থিত করা হইয়াছিল। লোকে ভাবিয়াছিল, হয়ত ইহাতে তাহাদের ভাঙ্গা কপাল জোড়া লাগিবে। কিন্তু প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সাফল্যের সরকারী জয়ধ্বনি সত্বেও লোকের দুর্দ্দশা ঘুচে নাই। ইহার পর দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা

আসিয়াছে; কিন্তু তাহাতে দেশের দরিদ্র, অর্দ্ধহারক্লিষ্ট মানুষের স্কন্ধে শুধু অতিরিক্ত বোঝার ভার চাপিবারই আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে।

কিসের আশায় তবে মানুষ স্বাধীনতা দিবসের উৎসবে মন-প্রাণ দিয়া অংশ গ্রহণ করিবে? মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের সমস্যাই যে শুধু মিটে নাই তাহা নয়—রাজ্য পুর্ণগঠনের নামে দেশের লোকের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর নূতন আঘাত আসিয়াছে। যে সমস্যা সমাধানের আশা স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বারম্বার দেশ নেতারা শুনাইয়াছিলেন, সে সমস্যার সমাধান আজ সুদূর পরাহত বলিয়াই মনে হইতেছে। দেশের সর্বত্র ভাষাগত রাজ্যের প্রশ্ন লইয়া যে বিক্ষোভ, অশান্তি ও উদ্যোগ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা শুধু সরকারী নীতির ব্যর্থতাই প্রমাণ করিতেছে না; প্রমাণ করিতেছে স্বাধীনতার যে রূপ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে তাহার মুলেই যেন কোথায় গলদ আছে।

ভারত আজ তাহার বৈদেশিক নীতি লইয়া গর্ব করিতে পারে, এ কথা প্রতিনিয়ত আমাদের রাষ্ট্রনেতারা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু সে গর্বের ভিত্তি যে কতখানি ফাঁকা তাহা পর্তুগীজ অধিকৃত ভারতের দিকে এবং কাশ্মীরের দিকে চাহিলে বুঝিতে কষ্ট হয় না। একথা আমাদের স্বাধীনতা দিবসে বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার যে, দেশের অভ্যন্তরের সমস্যা যদি ক্রমশঃ পর্বত প্রমাণ হইয়া উঠে, তবে বাহিরের জৌলুষ এবং চাকচিক্য দিয়া গুরুতর সংকটকে শেষ অবধি ঠেকানো যাইবে না। স্বাধীনতা কোন জাতির জীবনে কেবল কথার কথা নয়। কেবল পরদেশের প্রত্যক্ষ বন্ধন মুক্তির নামই স্বাধীনতা নয়। স্বাধীনতাকে দেশের মানুষের জীবনের প্রতি স্তরে যদি পরিব্যাপ্ত করা না যায়—আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতার ছাপ না পড়ে, চিন্তার ক্ষেত্রে যদি স্বাধীনতার আত্মপ্রতিষ্ঠা না ঘটে, তবে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস

পালন শুধু একটি অর্থহীন আনুষ্ঠানিক আচার নিষ্ঠায় পর্যবসিত হইবে।



পনেরোই আগস্ট

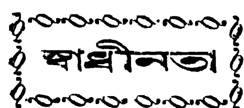
অদ্য ১৫ই আগস্ট পবিত্র স্বাধীনতা দিবসে আমরা জাতীয় পতাকাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি এবং যে সমস্ত ত্যাগ-ব্রতী সাধক ও বীর সৈনিকের জীবনব্যাপী তপস্যার ফলে স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদ জাতির করতলগত হইয়াছে, তাঁহাদের উদ্দেশে আন্তরিক প্রণতি নিবেদন করিতেছি। দুইশত বর্ষের বিদেশী শাসন এখন হইতে দশ বৎসর আগে ১৯৪৭ সালে এই পুণ্য তিথিতে শেষ হয় এবং দেশের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের হাতে দেশের শাসনভার ন্যস্ত হয়। দেশ ও জাতির ইতিহাসে এই দিনটি তাই একটি চিরস্মরণীয় দিন—এই দিনের প্রান্তে আসিলে তাই ছোট বড় নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর মাথাই অভাবনীয় একটি আবেগে নুইয়া পড়ে। যে স্বাধীনতার জন্য আমাদের পিতৃ-পিতামহগণ, জ্ঞান ও কর্ম রাজ্যের পূর্বাচার্যগণ অনেক দুঃখ হাসিমুখে বরণ করিয়াছেন, যে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুকে লইয়া তাঁহারা একদিকে জাতির নৈতিক ও মানসিক উৎকর্ষ বিধানের জন্য দিক-বিদিকের জ্ঞান-সমুদ্র মন্থন করিয়া দুই হাতে অমৃত আহরণ করিয়া আনিয়াছেন, অন্যদিকে কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যে জাতিকে

স্বাবলম্বী করিবার জন্য বিচিত্র কঠিন পথে আপন আপন কর্ম-শক্তি প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীনতা যে একদিন দেশের আকাশে সত্য সত্যই নব দিনের উজ্বল অরুণালোকে প্রকাশমান হইবে, ইহা অনেকেরই ভাবনার অতীত ছিল। জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসিকাষ্ঠে একে একে যাহারা পরাধীন জাতির মুক্তি কামনার প্রাপ্য বরলাভ করিয়াছেন, অনশনে. নির্যাতনে, বঞ্চনায় যাঁহারা জীবনের সমস্ত সম্ভাবনীয়তাকে তিলে তিলে দেশমাতার উদ্দেশে অঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহারাও জানিতেন না যে একদিন তাঁহাদের তপস্যা জয়যুক্ত হইবে। সাধকের একাগ্রতা ও যোদ্ধার মৃত্যুপণ ঐকান্তিকতা লইয়া তাঁহারা দিনের পর দিন আদর্শের দীপটি প্রোজ্জ্বল রাখিয়া গিয়াছিলেন, শুধু তাঁহাদের ভাবী বংশধররা এই দীপকে একদিন অনির্বাণ সূর্যের দীপ্তিতে রূপান্তরিত করিবেন এই আশায়। সেই আশার সার্থক পরিপূর্ণতার দিনে আজ জাতির প্রাণ-সমুদ্র তাই উচ্ছল আনন্দে কল্লোলিত হইয়া উঠিবে। দুঃখ, বেদনা, আঘাত-অবমাননা যেখানে যা আছে, যার যা আছে, সব কিছুকে ছাপাইয়াই এই দিনের আনন্দ সহস্র ধারায় আজ দেশের আকাশ-মাটি প্লাবিত করিবে। মুঘল শাসনের শেষ ধাপে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবন যখন খণ্ড বিক্ষিপ্ত, ছিন্ন-ভিন্ন ভাগ্যান্বেষী বিদেশীরা সেই সময় বণিকের ছদ্মবেশে হানা দেয় এদেশের মৃত্তিকায়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ফরাসী ইংরেজ, কে না আসিয়াছিল? স্বার্থ ও সুবিধার কাড়াকাড়ি লইয়া অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ও মারামারি কাটাকাটির পরে সবাই পিছু হটিয়া গেল, শুধু ইংরেজ এবং ইংরেজের সন্ধি সর্তে ফরাসি ও পর্তুগীজের কয়েকটা ছিট তালুক এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া রহিল। এই যে সাম্রাজ্যবাদী-বৃটিশ শাসন কায়েম হইল ভারতবর্ষে, ইহা ভারতবর্ষের জীবনে চরম দুর্ভাগ্য ও বিপর্যয়ের কালো মেঘ রূপেই উদিত হইল। দেশের শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, তাহার নিজস্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারায় ছেদ পড়িল—গ্রাম্য জীবনের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল। নূতন

গজাইয়া উঠা শিল্পনগরীগুলির ধাক্কায়, নগরেও শান্তি শৃঙ্খলা অন্তর্হিত হইল অসম ধন বণ্টনের ধাক্কায়। ফলে সারা দেশ দৈন্য, দুর্ভিক্ষ ও অনাচার স্বৈরাচারে বিধ্বস্ত হইতে লাগিল—আর এই ভাঙনের সুযোগেই কৌশলী সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন উত্তরে পাঞ্জাবী, জাঠ ও রাজপুতের, পূর্বে বাঙালী, ওড়িয়া ও মণিপুরীদের, পশ্চিমে মারাঠা ও দক্ষিণে অন্ধ্রদের স্বাধীনতার পাঁজর ভাঙ্গিয়া দিয়া সমগ্র ভারতে একচ্ছত্র শাসন প্রবর্তণ করিল। ভারতবর্ষ হইতে সুলভে আহৃত কাঁচামালে স্বদেশের কারখানায় বানানো পণ্য আনিয়া আবার ভারতের বাজারেই বেচিতে এবং এইভাবে কামানো কোটি কোটি টাকায় নিজ দেশের তহবিলও স্ফীত করিতে লাগিল। এই সর্বগ্রাসী জুলুমকে ভারতবর্ষ কোনদিনই অবশ্য নিরুপায় বশ্যতায় মানিয়া লয় নাই--ইংরেজ রাজত্বের সূচনা হইতেই এক এক করিয়া পিণ্ডারী, ঠগী, সন্ন্যাসী ও সাঁওতালদের বড় বড় বিদ্রোহ হইয়াছে, হইয়াছে উৎপীড়িত কৃষকদের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ নীল বিদ্রোহ, সামন্ত নৃপতি ও জনগণের মিলিত উদ্যমে পরিচালিত অধিকতর প্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ। ইংরেজের দৃপ্ত অস্ত্রবল এ সমস্তকেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা করিয়া দিয়াছে, তবু জাতির প্রাণলোক হইতে স্বাধীনতার আগুন নিভিয়া যায় নাই। সিপাহী বিদ্রোহের পর একদিকে যেমন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হইতে খোদ বৃটিশ সরকার ভারত শাসনের কর্তৃত্ব স্বহস্তে লইলেন, অন্যদিকে তেমনি জাতির আশা আকাঙ্খাকে সংহত ও কর্মের মধ্যে রূপায়িত করার জন্য ভারতবাসীও জাতীয় কংগ্রেস গঠন করিলেন। অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল এই জাতীয় মহাসভা স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাইয়াছেন—ইহাদেরই পাশাপাশি চলিয়াছে বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রাম। বহু মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে এই-ভাবে দেশকে দিয়াছে যে নব জীবনের দীক্ষা, তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অন্তে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতার মধ্যে অবশেষে

মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া জাতির দুই শতাব্দী ব্যাপী সাধনার সিদ্ধি-লাভে পর্যবসিত হইয়াছে।

কিন্তু স্বাধীনতা লাভ মানেই সকল সুখ, সমস্ত সমৃদ্ধি বৃষ্টির মতো দেশের মাথায় ঝড়িয়া পড়িতে পারে না, তা পড়েও নাই। শিক্ষা সংস্কৃতি ও শিল্প বাণিজ্যে অনগ্রসর, দারিদ্রোপহত দেশকে যুগের পথে আগাইয়া আনার জন্যও চাই দুষ্কর প্রয়াস, দুশ্চর কঠিন শ্রম। সেই পথে আমরা সবে পা বাড়াইয়াছি, এখনো বহু পথ সম্মুখে। এই সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী অপকৌশলে দেশের যে দুটি অংশ মাতৃভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হইয়াছে, তাহাও আমাদের যাত্রা পথে সৃষ্টি করিয়াছে দুর্জয় দুর্ভাগ্য ও দুরতিক্রম্য সঙ্কটের বাধা। তাই স্বাধীনতার অতুল ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত হইয়াও জাতির হৃদয় বেদনা স্তিমিত হয় নাই। দুঃখ ব্যাথার বিভ্রান্ত মানুষ যাহা পরম গৌরবের, তাহাকেও সমুচিত গৌরবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু এই জড়তা ও দৈন্য আমাদিগকে কাটাইয়া উঠিতে হইবে—যে আশা ও অনির্বাণ পৌরষ লইয়া আমরা স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়াছি ঠিক সেইরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় লইয়া আমাদিগকে আজিও সংগ্রাম করিতে হইবে দারিদ্রের বিরুদ্ধে, অসাম্য ও কদাচারের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামের সফলতার উপরেই গড়িয়া উঠিবে উজ্জ্বল অনবদ্য সমুন্নতির মন্দির। স্বাধীন ভারতের সেইখানেই হইবে প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ১৫ই আগস্টের এই শুভ প্রভাতে সেই অনাগত সুদিনের উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের সমস্ত প্রাণের অনুরাগ নিবেদন করিয়া দিতেছি এবং যে ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা আজ আকাশে উড্ডীন হইয়া সাঁইত্রিশ কোটি ভারতবাসীর জ্ঞান ও কর্ম আশা ও সপ্নকে মূর্ত্ত করিয়াছে, তাহাকে আর একবার জয়ধ্বনি সহকারে প্রণাম করিতেছি। জয়হিন্দ!



স্বাধীনতা দিবস

আজ ১৫ই আগস্ট। এই দিনটিতে আমাদের দেশের জনগণের সহিত আমরা একত্রে স্বাধীনতা দিবস পালন করিতেছি। আজ আবার আমরা সকলে সুখী-সমৃদ্ধ ভারত গঠনের শপথ নুতন করিয়া গ্রহণ করিব।

ভারত হইতে বৃটিশের শাসন প্রত্যাহারের ফলে আমাদের মহান দেশের সম্মুখে এক বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। ইহাই ১৫ই আগস্টের তাৎপর্য্য, শতাব্দী-বঞ্চিত সার্ব্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ আমরা পাইলাম। জাতি পুঞ্জের মধ্যে সম্মানের আসন লাভের সুযোগ ভারত পাইল। জনসাধারণের ভবিষ্যৎ ও দেশ পুণর্গঠণের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখা দিল। ইহাই ১৫ই আগস্টের তাৎপর্য্য।

সারা দেশব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের বিশাল জোয়ারের সামনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে বাধ্য হইয়া ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা ভাবিয়াছিল, কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের সহিত আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে, চাপসৃষ্টি ও কূটনীতির সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদ আমাদের জনসাধারণকে স্তব্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে, আমাদের দেশকে বৃটিশের রথচক্রের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে সক্ষম হইবে। দেশের ভিতর ও বাহিরের বিগত কয়েক বৎসরের ঘটনাবলী সাম্রাজ্যবাদের সেই আশা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়াছে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পরবর্তী নয়টি বৎসরে সারা বিশ্বে শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের শক্তির বিরাট অগ্রগতি হইয়াছে। বিশেষ করিয়া এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণের অভূতপূর্ব্ব নব-জাগরণ দেখা দিয়েছে এই সময়ের মধ্যে। এই অভ্যুত্থানের ফলে ঔপনিবেশিক অত্যাচার, লুণ্ঠন ও শোষণের দুর্গগুলি একটি একটি ধ্বসিয়া পড়িতেছে। আমাদের বন্ধু মিসর কর্তৃক সুয়েজখাল কোম্পানীর বীরত্বপূর্ণ জাতীয়করণ জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের শক্তির দুর্দ্দমনীয় অগ্রগতির সর্বশেষ প্রকাশ।

এবারকার স্বাধীনতা দিবসে আমরা মিসরের জনসাধারণের প্রতি আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। স্বাধীনতা ও সার্বভৌম অধিকার রক্ষার সংগ্রামে মিসরের প্রতি আমাদের সৌভ্রাতৃত্বের শপথ জ্ঞাপন করিতেছি। মিসরের এই আদর্শ সারা এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির আদর্শ। আজিকার এই স্বাধীনতা দিবসে আমাদের মহান দেশ ভারত বিশ্ব-রাজনীতিতে যে ভূমিকা পালন করিতেছে তাহাতে আমরা গর্ববোধ করি। আজ আমাদের সকলের পক্ষেই ইহা একটি বিশেষ আনন্দের বিষয় যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের নয় বৎসরের ভিতর ভারত শান্তি, স্বাধীনতা ও এশীয় সংহতির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রামকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি প্রশ্নের উপর বর্তমান ভারত সরকারের দ্বিধা ও ব্যর্থতার কথা আমরা কখনওই বিস্মৃত হইতে পারি না। গোয়ার আশু মুক্তির পথে সরকারের দ্বিধা-জড়িত মনোভাব অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। গত বৎসর এই ১৫ই আগস্টে গোয়া-মুক্তি-সংগ্রামে আমাদেরই কিছু সংখ্যক দেশবাসী পর্তুগীজ-ফ্যাশিস্টদের বুলেটে নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন। আমাদের শহীদদের নামে আসুন আমরা আজ আমাদের পুণ্যভূমিতে ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের শেষ নিগড় ছিন্ন করিবার সংগ্রাম চালাইয়া যাইবার শপথ পুনর্ব্বার গ্রহণ করি।

কমনওয়েলথের বন্ধনের কথাও আমরা এক মুহূর্ত্তের জন্যও

ভুলিতে পারিনা। মালয়, সাইপ্রাস, ও বৃটিশ সাম্রাজ্যধীন অন্যান্য দেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে ভারতের পূর্ণ সমর্থন জানাইবার পথে কমনওয়েলথের এই বন্ধন প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান বিশ্বে ভারতের মর্য্যাদার সঙ্গে এই বন্ধনের কোন সঙ্গতিই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কমনওয়েলথের এই বন্ধন আমাদের ছিন্ন করিতেই হইবে।

ভারতের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও বিগত নয় বৎসরে আমরা দেশের দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের বিপুল অগ্রগতি লক্ষ্য করিয়াছি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কুপরামর্শ ও সরকারের হিংসা-নীতি তুচ্ছ করিয়া দেশের শ্রমিক, কৃষক এবং অন্যান্য মেহনতী জনসাধারণ নিজেদের মৌলিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, দেশকে উন্নতিতে অগ্রসর করার জন্য প্রাণ পণ সংগ্রাম চালাইয়াছেন। এমন কি সরকারের কতকগুলি নীতি ও ব্যবস্থার মধ্যে, বিশেষ করিয়া ভারতকে শিল্পোন্নত করিবার জন্য দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এই সব ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হইয়াছে। আরো বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল—আজ আমাদের দেশের মানুষ সমাজতন্ত্রের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, ভারতের জনসাধারণ আজ সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বেলিত। উত্তরোত্তর তাহারা উপলব্ধি করিতেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ চিহ্নগুলি মুছিয়া ফেলিতে হইবে। সমাজতন্ত্রের রাজপথ ধরিয়া ভারতকে অগ্রসর হইতে হইবে। ভারতের এই নবচেতনা ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার পথ প্রশস্ত করিতেছে!

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আমরা ১৫ই আগস্ট প্রতি-পালন করিতেছি ইহা সত্য, কিন্তু তথাপি ভারত আজো বৃটিশ মূলধনের নিষ্ঠুর শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ। ভূম্যধিকারীদের নির্যাতন ভারতের কোটি কোটি কৃষক জনসাধারণের জীবনী-শক্তিকে আজো শুষিয়া লইতেছে। একচেটিয়াপতি ও মুনাফাবাজদের লালসাস্পৃহা এখনো

দমিত হয় নাই, ফলে নিষ্পেষিত জনতার দুঃখযন্ত্রণা বাড়িতেছে, জাতির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। দেশী ও বিদেশী শোষণকারীর দল যখন আমাদের মাতৃভূমির প্রকৃত সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য দখল করিয়া ফাঁপিয়া উঠিতেছে ঠিক তখন অগণিত মেহনতকারী জনসাধারণ অসহনীয় দারিদ্র্যপূর্ণ ও দুর্দশাময় জীবন-যাপনে বাধ্য হইতেছে। সারা দেশ বেকারে ছাইয়া গিয়াছে। কর্ম-সংস্থানের বেদনাময় অভাব প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার জন্য নিশ্চয়ই সরকারের কয়েকটি নীতি প্রধানতঃ দায়ী।

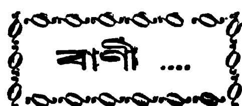
জনসাধারণের সংগ্রাম ও তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রচেষ্টা দমনের জন্য এবং দেশের শত্রুদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের রাষ্ট্র-ক্ষমতা প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সামান্যতম অজুহাতে আমাদের দেশবাসীকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়— ইহা অতিশয় লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয়। "দেখিবামাত্র গুলি চালাও" এবং "হত্যার জন্য গুলি চালাও"—এই ধরণের নির্দ্দেশে আমাদের দেশের মানুষের উপর প্রায়ই গুলিবর্ষণ করা হয়। বোম্বাই-এর গুলি চালনার উল্লেখপ্রসঙ্গে সেদিন আমাদের প্রাক্তন অর্থ-সচিব শ্রীচিন্তামন দেশমুখ এই কথাই দেশবাসীর সামনে বলিয়াছিলেন। পুলিশের গুলিচালনা ছাড়াও, বৃটিশ-সৃষ্ট মনুষ্যত্বহীন আমলাতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা তো দূরের কথা ইহাকে বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠী আরো শক্তিশালী করিয়াছেন। এই সমস্ত দেশকে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির শ্বাসরুদ্ধ করিতেছে, দেশের উন্নতি ব্যহত করিতেছে।

পনেরই আগস্ট আমাদের হিসাব-নিকাশের খতিয়ানের এই অশুভ দিকটি ভুলিয়া গেলে চলিবে না, অথবা ইহা হইতে যে কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ আসে তাহা আমাদের দৃষ্টিপথ এড়াইয়া গেলেও চলিবে না। সাফল্যের জন্য যেমন আমরা আনন্দ করিব, তেমনি যে-শপথ আমাদের এখনো অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে তাহা বিস্মৃতও হইব না।

আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে জনসাধারণের জীবন ও জীবিকার অবস্থার উন্নতির এবং সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বাস্তবে

রূপান্তরিত করিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন—প্রকৃত দেশ-গঠন প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা, দেশ ও জনসাধারণের স্বার্থ-পরিপন্থী নীতিগুলির বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে ব্যাপক ঐক্য গঠন করা। বিরোধী গণতান্ত্রিক দলগুলি অথবা কংগ্রেসের অনুসরণকারী সমস্ত জনসাধারণই গভীর দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক আগ্রহ দ্বারাই পরিচালিত হয়, নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সাধারণ কামনায় তাহারা চালিত হয়। দেশের স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার উদগ্র আকাঙ্খায় দেশের সমগ্র জনসাধারণ উদ্বুদ্ধ হইয়া অগ্রসর হয়।

আজিকার স্বাধীনতা দিবসে, আসুন, আমরা সাধারণ মানুষের সমস্ত শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার কর্ত্তব্য পালনে নিজেদের উৎসর্গ করি। এই ব্যাপক জন-ঐক্য গঠনের পথেই জগৎ-সভায় ভারতের আসন আরো উচ্চে উন্নীত হইবে ; এই পথেই ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সত্যকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হইবে।



যখনই জাতীয় শরীর দুর্বল হয়, তখনই সেই জাতির রাজনৈতিক, সামাজিক, মানসিক ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়েই সর্বপ্রকার রোগাণু প্রবেশ করে ও রোগ উৎপাদন করে। অতএব ইহার প্রতিকারের জন্য রোগের মূল কারণ কি দেখিতে হইবে এবং রক্তের সর্ববিধ মলিনতা দূর করিতে হইবে। একমাত্র কর্তব্য হইবে—লোকের মধ্যে শক্তি সঞ্চার, রক্তকে বিশুদ্ধ করা, শরীরকে সতেজ করা, যাহাতে উহা সর্বপ্রকার বাহ্য বিষের দেহপ্রবেশ প্রতিরোধ ও ভিতরের বিষকে বাহির করিয়া দিতে পারে আর আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ, বীর্য এমন কি, জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বা
ধী
ন
তা
র
দশ
ব
ছ
র

১৯৫৭

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক জনসেবক
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা

....

- বাণী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

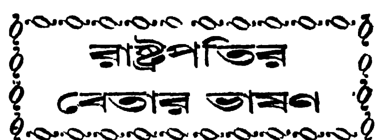
-এবং

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের একশত বছর

স্বাধীনতা সংগ্রামে বহু যুবক, বহু যুবতী, বহু বালক, বহু বালিকা বৃটিশ বর্বর শাসনের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিলেন, একশত বছরের ইতিহাসের পাতায় তাঁদের সেই দুঃসাহসিক সংগ্রামের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁদের সংগ্রামী ভূমিকায় আজ আমরা স্বাধীন—কিন্তু স্বাধীনতার যে স্বাদ —তা কি বর্তমান যুবকরা পাচ্ছেন—?

স্বাধীনতা লাভের দ্বারা আমরা কি চেয়েছিলাম—আর কি পেলাম—? যে দেশের শতকরা তিরিশ জন লোকও শিক্ষিত নয়, যারা খেতে পায় না, যারা বাসস্থানের সুযোগ পায় না, , যারা কাজ চাইলে পায় না, যারা সামান্য অর্থের লোভে জঘন্যতম পাপ কাজও করতে পারে—যাদের নিজস্ব বক্তব্য রাখবার অধিকার নেই—তাঁদের সংগ্রামী ভাইবোনেরা কি এই স্বাধীনতাই চেয়েছিলেন—?

দেশ স্বাধীন—দুঃশাসন যদি হয় দমন করা হবেই



সঙ্কট সময়ে প্রত্যেক নাগরিককে আন্তরিক সততার সহিত কর্তব্য সম্পাদনে আহ্বান

অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্জনের আবেদন

নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট—"রাজনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে থাকিয়া যদি সকল নাগরিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে না পায় অর্থাৎ তাহারা যদি জীবনের সর্বনিম্ন স্বাচ্ছন্দ্য না পায় ও অভাবের তাড়না হইতে পূর্ণ মুক্তি না পায় তবে ঐ রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা যায় না। রাজনৈতিক মুক্তি হইতে অর্থনৈতিক মুক্তিলাভ করিতে হইলে বদ্ধপরিকর চেষ্টা দরকার এবং জাতির মঙ্গলের জন্য ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন প্রয়োজন। বর্তমানে সঙ্কট সময় সমুপস্থিত। প্রত্যেক নাগরিক এই পরীক্ষার সময় আন্তরিক সততার সহিত তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিবে—দেশ আজ ইহাই আশা করে। ভারতের এই আহ্বানে আমরা যে সাড়া দিতে পশ্চাৎ পদ হইব না, ইহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

বেকার সমস্যা ও দুর্গতি মোচনে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হইতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতার দশম বার্ষিকী দিবসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নেহরু যেভাবে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ পন্থায় দেশের পরাধীনতা মোচন করিয়াছিলেন, সেইভাবে তাঁহাদের দৃঢ়-সঙ্কল্প ও নির্ভীক হৃদয়ে দেশের দারিদ্র্য মোচনে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত থাকিবার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম অনেক সময় প্রতিহত হইয়াছে ও আমরা ব্যর্থ হইয়াছি। আমরা হৃদয়বিদারক এই ব্যর্থতার সম্মুখীন হইয়াছি, কিন্তু সংগ্রাম ত্যাগ করি নাই।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত আজ বহু সমস্যার সম্মুখীন—তাহার মধ্যে খাদ্য সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সকলেই বিব্রত হইতেছেন। যাঁহাদের আয় কম অন্যদের অপেক্ষা, তাঁহাদের উপরই এই বোঝা পড়িয়াছে বেশি।'

পি, টি, আই

পনরই আগস্ট

আজ পনরই আগস্ট ভারতের জাতীয় মুক্তির চির আকাঙ্ক্ষিত দিন। পরাধীনতার যে সুচিরশর্বরী দীর্ঘ সার্ধশতাব্দীকাল ধরিয়া ভারতের ভাগ্যাকাশে নিবিড় তমসায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ভারতের স্বাধীনতা সূর্য সমুদিত হয় এই দিনটিতে। যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাহার সামরিক ব্যাণ্ডে "রুল বৃটেনিয়া" গান বাজাইয়া একদা ভারতের উপকূলে অবতরণ করে, দশ বৎসর পূর্বে ঠিক এই দিনটিতে সে-ই আবার তাহার ব্যাণ্ডে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া ভারতীয় উপকূল ত্যাগ করিয়া যায় জীবন-জোয়ারের বানে বাহিত হইয়া যাহারা এদেশে আসিয়াছিল, ভাটার টানে তাহারা আবার গা ভাসাইল স্বদেশের অভিমুখে। সিন্ধু সলিলে মুক্তিস্নান সারিয়া শৃঙ্খলমুক্ত ও শুচিস্নাত ভারত সমুন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইল বিশ্বসভার মণ্ডপে। কবি বর্ণিত সুনীল জলধি হইতে ইহা যেন ভারতের পুনরুভ্যুত্থান! বিশ্ব জুড়িয়া তাই সে দিন সে কী হর্ষধ্বনি, সে কী জয়োল্লাস! ভারতের বুকে সে কী পুলক, সে কী বেদনা!

পরাধীনতার বন্ধন-জর্জর জাতি মুক্তির মধ্যে যে আনন্দের সন্ধান পাইল পরম পরিতৃপ্তির সহিত তাহা আস্বাদন করিবার সৌভাগ্য হইতে সে হইল বঞ্চিত। দেশ বিভাগ ও তজ্জনিত বিপর্যয় বেদনার গরল মিশাইয়া আনন্দের সে সঞ্চয়কে তিক্ত ও

বিষাক্ত করিয়া তুলিল। এক চোখে হাসি ও অন্য চোখে অশ্রু লইয়া সদ্য মুক্ত ভারত উঠিয়া দাঁড়াইল সে কি অপরূপ মূর্তিতে! কিন্তু জাতীয় মুক্তি যে অর্জন করিয়াছে, জাতি গঠনের দুরূহ দায়িত্ব আসিয়া তাহার স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে আপনা হইতেই। দুস্পূরণীয় দাবী লইয়া সে দায়িত্ব যাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান, ব্যথা লইয়া বিলাপ করিবার তাহার অবকাশ কোথায়! বৈদেশিক শাসন বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইবার আগে জীবন শোণিতের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত শোষণ করিয়া জাতিকে সে শায়িত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে রক্তশূন্যরোগীর শয্যায়। তাহার নিস্পন্দ-প্রায়-বক্ষে ধ্বনিয়া তুলিতে হইবে নবজীবনের প্রাণস্পন্দন, তাহার শিথিল প্রায় সর্বাঙ্গে জাগাইয়া তুলিতে হইবে নূতন জীবনের জাগরণ-চাঞ্চল্য। বেদনার্ত জাতির অশ্রুপিচ্ছিল পথে, বাধা ও বিঘ্নের দ্বারা কণ্টকিত দুর্গম পথে স্বাধীন ভারত তাহার নূতন জীবন যাত্রায় প্রথম পদবিক্ষেপ করিল, শত দিকে শত বাহু বিস্তার করিয়া সংগ্রামরত হইল সেইসব অভিশাপের বিরুদ্ধে পরশাসন যাহা প্রসব করিয়া রাখিয়া গিয়াছে ভারতের মৃত্তিকায় সর্বস্বপণ সে সংগ্রাম আজও চলিতেছে, সর্বনাশা সে অভিশাপ আজও অবিজিত, অভিশপ্ত জাতির মর্মস্থলে আজও তাহা বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে দুঃসহ শেলের মত। জানি না, সে শেল জাতির বুক হইতে সমূলে উৎপাটিত হইবে কবে ও কত দিনে!

জাতির বিভিন্ন জীবন ক্ষেত্রে বহু বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি আজও লিপ্ত রহিয়াছে প্রাণান্ত সেই সংগ্রামে। জাতির জীবন ও উত্থান পতন নির্ভর করিতেছে এই যুদ্ধেরই জয় পরাজয়ের উপর; এই যুদ্ধের হারজিতের উপরেই জাতির শক্তি ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। পরাধীনতার পাষাণ চাপ উৎক্ষিপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শক্তি ও প্রতিভার নিরুদ্ধ উৎসমুখ অবরোধমুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং উন্মুক্ত সেই দ্বারপথে বাহির হইয়া আসিয়া তাহারা নিজদিগকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছে জাতি গঠনের দুরূহ সাধনায়।

গবেষণারত বৈজ্ঞানিক, গঠনরত শিল্পী ও কর্মরত শ্রমিকের সাধনার ত্রিবেণী-সঙ্গমে চলিয়াছে নব মহাভারত রচনার ভিত্তিপত্তন।

এবারের পনরই আগস্ট এক বিশেষ বার্তা বহন করিয়া ভারতের দ্বারে সমাগত। এ বৎসর ভারতীয় স্বাধীনতার উৎসবমুখর অঙ্গনে উদ্‌যাপিত হইবে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসব। সে সংগ্রামের শহীদ ও সৈনিকগণ জাতীয় মুক্তির যজ্ঞকুণ্ডে যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, জাতি বংশপরম্পরায় পবিত্র সে হোমকুণ্ডে সমাধিরূপে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহাদের যাহা কিছু কামনার ও বাসনার সামগ্রী। তাই সে আগুন কোন দিনই নির্বাপিত হয় নাই। কখনও তাহা স্তিমিত হইয়াছে আবার কখনও বা জ্বলিয়া উঠিয়াছে রুদ্র তেজে ও ক্রুদ্ধ আক্রোশে সহস্র শিখা বিস্তার করিয়া। তাঁহারা যে পথের সূচনা বিস্তার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, কিঞ্চিন্ন্যূন শতাব্দীকাল ধরিয়া দীর্ঘ দুর্গম পথ পর্যটন শেষে আমরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহারই পরিসমাপ্তিতে; তাঁহারা যে সাধনার সূত্রপাত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, আমরা আজ আসিয়া উপনীত হইয়াছি তাহারই সার্থকতায় ও সিদ্ধিতে। স্বাধীনতা উৎসবের উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া তাই স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সব বীর সৈনিক ও মরণব্রতী শহীদদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করিতেছি, যাঁহাদের শৌর্য, বীর্য ও আত্মদান আমাদের গন্তব্যপথের সহায়, সম্বল, পাথেয় ও প্রেরণা। বন্দেমাতরম্!

দৈনিক জনসেবক

স্বাধীনতা দিবস

ব্যক্তির জীবনে যেমন এক একটি ক্ষণ আসে, মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয়, এই জন্যই যেন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, জাতীয় জীবনেও তেমনি দুর্লভ ক্ষণ আসে। তাহা আরো মহত্তর, আরো তাৎপর্যময়।

জাতির সমগ্র সত্তা সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত স্মরণে উদ্দীপনা ও প্রেরণা-নুভব করে। ভারতের ইতিহাসে আমাদের জাতীয় জীবনে ১৫ই আগস্ট তেমনি একটি দিন—অতিস্মরণীয় দিন। আজ পুণ্যাহ ১৫ই আগস্ট। মহাসমাদরে ও মহামর্য্যাদায় এই দিনটিকে স্বাগত জানাইতেছি। আমাদের অন্তরের সকল আবেগ, সকল নিষ্ঠা লইয়া এই দিনটিকে বরণ করিতেছি আর স্মরণ করিতেছি এই দিনটির সুগভীর তাৎপর্য, উদাত্ত আহ্বান, একান্তিক নির্দেশ। জাতির ইতিহাসের পরম ক্ষণ এই দিনটির দ্বারা চিহ্নিত। আমাদের আত্ম-বিকাশের, আমাদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার সূচনা এই দিনটিতে—১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট। সেই সূচনা হইতে আমরা অগ্রসর হইয়া চলিয়াছি। সারা দেশ ব্যাপিয়া তাহার বিপুল আয়োজন। আমাদের অগ্রগতির পথে সাফল্যের সঙ্গে অসাফল্যও হয়তো বিরল নয়। কিন্তু আজ এই সালতামামিই করিব, বহু বিপত্তি, বাধা, সংস্থানের স্বল্পতা, অভাব সত্বেও আমরা অগ্রসর হইতে পারিতেছি কি না? আমাদের রাষ্ট্রের জন্য আমরা গর্ব ও গৌরবানুভব করিব কিনা? আমাদের গভীর বিশ্বাস আছে যে, আজিকার দিনে আমাদের আনন্দের যথেষ্ট হেতু আছে। স্বাধীন ভারতের অগ্রগতি প্রামাণ্য সত্য; ভারতের কর্মনীতি, ভারতের আদর্শ নূতন প্রভায় ভাস্বর। এই দেশের নাগরিক আমরা, আমাদের পরম আনন্দের দিন এই পনেরই আগস্ট।

এই বৎসরের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী উৎসবের সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ১৮৫৭র সিপাহী আন্দোলনকে যে নামেই আখ্যাত করা হউক লেশমাত্র সন্দেহ নাই যে, দেশপ্রেমেই এই আন্দোলন সঞ্জীবিত হইয়াছিল, পুষ্ট হইয়াছিল এবং সেদিনের সেই সূচনাই পরবর্তীকালের সংগ্রামকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। আমরা একান্তভাবে সেদিনের সেই বীর সংগ্রামী সিপাহীদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী, কিন্তু

উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ—যেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ সেদিন সে মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া থাকে।' আজ সেই শক্তিই কি অনুভব করিব না? ভারতের নূতন ইতিহাস রচিত হইতেছে। জাতির উৎসাহে ও উদ্দীপনায়, জাতির কর্মোন্মাদনায় ও আত্মপ্রত্যয়ে এই শক্তির বিকাশ ঘটিবে যেদিন, সেদিনই আমাদের উৎসব পালন পূর্ণাঙ্গ হইবে। আমরা জাতিগতভাবে সেই পথেই কি অগ্রসর হইতেছি না? আজ স্বাধীনতা বার্ষিকীর উৎসব পালন করিতে যাইয়া স্বাধীনোত্তর ভারতের অগ্রগতির সালতামামী করিতেছি এবং আরও প্রযত্ন, আরও অধ্যবসায়, আরও নিষ্ঠায় অগ্রসর হইবার, জাতির আরব্ধ আত্মসংগঠন ব্রত সম্পূর্ণ করিবার, স্বার্থক করিবার সংকল্প করিতেছি। আনন্দোৎসব করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আগামী উজ্জ্বল দিনকে ত্বরান্বিত করিবার সংকল্পও গ্রহণ করিতেছি। ১৫ই আগস্ট এই ভাবেই জাতির জীবনে মহাতাৎপর্যময় দিবসরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রার্থনা উচ্চারণ করি, নূতন ভারতকে সর্বাত্মক প্রয়াসে ও প্রযত্নে যেন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। যেন গভীর আত্মবিশ্বাস আমাদের বর্মস্বরূপ হয়। নিরলস কর্ম সাধনায় যেন ব্রতী হই। এই ভাবেই জাতির জয় সাধন করিব, সুনিশ্চিত করিব। জয় হইবে নূতন ভারতের।

দৈনিক বসুমতী

স্বাধীনতা দিবস

দেখিতে দেখিতে আমাদের স্বাধীনতা লাভের ১০ বৎসর কাটিয়া গেল। আজ আমরা স্বাধীনতার একাদশ বৎসরের দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। ইতিহাসের কাছে দশ বৎসর হয়ত কিছুই নয়। হয়ত একশত বৎসরও ইতিহাসের কাছে একটি ক্ষুদ্র মুহূর্ত

মাত্র। কিন্তু মানুষের কাছে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মাস, প্রতিটি বৎসর অত্যন্ত মূল্যবান। ইতিহাসে ২০ বৎসরে এক পুরুষ ধরা হয়। সুতরাং স্বাধীনতার দশ বৎসরে এক পুরুষের অর্ধেক জীবনকাল কাটিয়া গিয়াছে। এই অর্দ্ধ পুরুষ সময়ের মধ্যে আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি—সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নতির পথে আমরা কতদূর আগাইয়া গিয়াছি, স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উৎসবের সমারোহের মধ্যেও একথা আমাদের মনে না জাগিয়া পারে না। স্বাধীনতা অমূল্য ধন। দেশবাসী দীর্ঘ সংগ্রামের ফলে এই স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। একশত বৎসর পূর্ব্বে সিপাহীদের অভ্যুত্থানের মধ্যে আরম্ভ হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। পলাশীর রণক্ষেত্রে মিরজাফর, উমিঁচাদের বিশ্বাসঘাতকতা ভারতে সূচনা করে ইংরেজ রাজত্বের। উহার একশত বৎসর পরেই স্বাধীনতার জন্য আরম্ভ হয় প্রথম সংগ্রাম। এই সংগ্রাম ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করিবার স্থানাভাব। ইংরেজ শাসক দৃঢ় হস্তে এই আন্দোলন দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য অদম্য আকাঙ্খা এবং আন্দোলন বিলুপ্ত হয় নাই। কংগ্রেস ও বিপ্লবী আন্দোলন গঙ্গা-যমুনার দুইটি ধারাপ্রবাহের মতই আবার প্রবলবেগে বহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এই আন্দোলনই সাফল্য মণ্ডিত হইয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট আমরা লাভ করিয়াছি স্বাধীনতা। আজ আমাদের স্বাধীনতা লাভের দশম বার্ষিক উৎসব। আজিকার এই পুণ্য প্রভাতে আমরা স্মরণ করিতেছি স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদবৃন্দকে, যাঁহারা নিজেদের জীবন দিয়া এই সংগ্রামকে জয়যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করিতেছি আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য। তাঁহাদের স্মরণ ও মননই স্বাধীনতাকে তাহাদেরই ঈপ্সিত লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর করিয়া দিতে আমাদিগকে সামর্থ্যদান করিবে।

একটা জাতির জীবনকে সমস্ত দিক দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তোলাই স্বাধীনতার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পথ যে ক্ষুরধারনিশিত দুর্গম

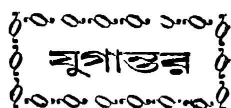
একথা অনস্বীকার্য্য। বিশেষতঃ আমাদের স্বাধীনতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কতকগুলি দুরূহ সমস্যা। ভারত বিভক্ত হইয়া আমরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা ও কাশ্মীর সমস্যা জাতীয় উন্নয়নের পথে প্রবল বাধা সৃষ্টি করিল। এই বাধা সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভারতের শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় এবং শাসনতন্ত্র রচিত হইয়া ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে আরম্ভ হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ। উহা সমাপ্ত হইয়াছে ১৯৫৫-৫৬ সালে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজ ব্যবস্থা গঠনই ভারতীয় রাষ্ট্রের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে স্বাধীনতার দশ বৎসর পূর্ণ হইয়া আরম্ভ হইল একাদশ বর্ষ। এই দশ বৎসরে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের উন্নতির জন্য নিম্নতম মজুরী আইন, বিধিবদ্ধ কর্মচারীদের রাষ্ট্রীয় বীমার আওতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বিলোপ করা হইয়াছে জমিদারী ব্যবস্থা, হিন্দু আমলের আইনের আমূল পরিবর্তন করিয়া হিন্দুদের মধ্যে এক পত্নীক বিবাহ ও বিবাহবিচ্ছেদের বিধান হইয়াছে, কন্যাকেও করা হইয়াছে পুত্রের সহিত পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। পল্লী অঞ্চলের উন্নতির জন্য কম্যুনিটি প্রজেক্ট ও জাতীয় উন্নয়ণ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, শিক্ষা ও স্বাস্থের উন্নয়ণ, গৃহনির্মাণ, ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধন প্রভৃতির কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে! এই দশ বৎসরের মধ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে স্বাধীন ভারতের উন্নয়ণের জন্য। ব্যবস্থা হইয়াছে আরও কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিবার। দামোদর ভ্যালী, কোশী, মহানদী, ভাকরা নাঙ্গাল প্রভৃতি পরিকল্পনা বিশ্ববাসীর দৃষ্টিও আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই।

বিভক্ত ভারতের শাসন ক্ষমতা বৃটিশ শাসকগণ কংগ্রেসের

হাতেই অর্পণ করেন। ১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেসই ভারতের শাসন ক্ষমতা লাভ করেন। কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধরণের সমাজ ব্যবস্থা গঠনের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। উহা দ্বারা তাঁহারা কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট করিয়া কোথাও বলা হয় নাই। পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার পথে ঐ দিকেই আমরা অগ্রসর হইতেছি, একথা আমাদিগকে শাসকবর্গ শুনাইয়া থাকেন। কিন্তু কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়া দেশবাসী আজ কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, দেশের বাস্তব অবস্থা দেখিয়াই তাহা বিচার করিতে হইবে। অধিক উৎপাদনের জন্য জোর দেওয়া হইতেছে। কিন্তু বণ্টনের সেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বজায় রাখা হইয়াছে। উৎপাদন বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র দেশ আজ অন্ন সঙ্কটের সম্মুখীন। বস্ত্রাভাব বাড়িয়াই চলিয়াছে, বস্ত্রের অভাবের জন্য নয়, ক্রয় শক্তির অভাবে। জাতীয় আয় বাড়িয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় বাড়ে নাই। জমিদারী ব্যবস্থা গিয়াছে, কিন্তু ভূমিহীন ক্ষেতমজুরেরা জমি পায় নাই। দশবৎসর পূর্ব্বে বাস গৃহের যে অভাব ছিল তাহা আরও বাড়িয়াছে। শিক্ষার উন্নতির নামে শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি করা হইয়াছে। জনসাধারণ চিকিৎসার কোন সুযোগ পাইতেছে না। বেকার লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। স্বাধীনতার দশ বৎসরে আমরা প্রাক যুদ্ধ যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও ফিরিয়া যাইতে পারি নাই। তথাপি একথা সত্য যে, আমরা জাতীয় মুক্তি লাভ করিয়াছি, আমরা মুক্ত হইয়াছি বিদেশী শাসন হইতে। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে পারি নাই। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু বিদেশী শাসন হইতে আমরা মুক্ত হওয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের শক্তি আমাদের আয়ত্তাধীনে আসিয়াছে। দেশবাসীকে নিজের শক্তিতেই এই অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে। আজিকার স্বাধীনতা দিবসের এই উৎসব

দেশবাসীকে সেই শক্তিতে শক্তিমান করিয়া তুলুক, দেশবাসীর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠুক স্বাধীনতা সংগ্রামের আত্মবলিদান।

বন্দে মাতরম্! জয়হিন্দ !!



দশম বার্ষিকী

১৯৪৭ সালের পনেরোই আগস্ট ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। আজ ১৯৫৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দশম বার্ষিকরূপে উদযাপিত হইবে। এই দিবসে প্রথমেই মনে পড়িবে তাঁহাদের কথা, যাঁহারা ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আত্মবিসর্জন দিয়াছেন। ভারতবর্ষের সেই অগণিত নাম না জানা সৈনিক, জনগণের মধ্য হইতে উদ্ভূত সেই বীর শহীদদের উদ্দেশ্যে আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছি। একমাত্র কয়েকজন স্বনামধন্য ও পুন্যশ্লোক নেতার জন্যই একটি বৃহৎ জাতি মুক্তিলাভ করে না। নেতৃত্বের পিছনে যখন বলিষ্ঠ গণ-চেতনা একত্র হয়; যখন লক্ষ বাহু অকুতোভয়ে উত্থিত হয়, শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তখনই নেতৃত্ব মহৎ ও সফল হইয়া উঠে এবং জাতীয় জীবনে যুগান্তরের সূচনা ঘটে। কংগ্রেস ও গান্ধীজীকে কেন্দ্র করিয়া ভারতবর্ষের শহরে ও গ্রামে এই গণ-চেতনা আসিয়াছিল এবং প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্য দিয়া নূতন শক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। ইহারও পূর্বে সুরু হইয়াছিল বাঙলাদেশের যুবকদের মধ্যে বিদ্রোহের চেষ্টা—বলিষ্ঠ সহিংস আন্দোলনের জীবন মৃত্যুর আশ্চর্য খেলা।

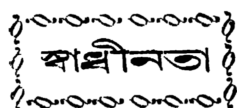
বাংলা দেশের মেয়েরাও রিভালবার ধরিয়াছিল, বোমা ও পিস্তল ছুড়িয়াছিল। ফাঁসির মঞ্চ ও ফুল মালঞ্চ এক হইয়া গিয়াছিল। কর্ম-মুখর রাজধানী হইতে শান্ত দূর পল্লীপ্রান্ত পর্যন্ত উদ্বেলিত জীবনের যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা ভুলিবার নহে। গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের শক্তিশালী ধারা শেষ পর্যন্ত গণ-আন্দোলনের মহাসঙ্গমে একত্র হইয়াছিল। হিংসা ও অহিংসার সূক্ষ্ম সীমা-রেখা দূর হইয়া গিয়াছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদহিন্দ্ ফৌজের সংগ্রামে এবং বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহে এবং ভারতবর্ষের শহরে শহরে রাস্তার লড়াইয়ে। অপরদিকে বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে দুর্বল ও মুমূর্ষ হইয়া পড়িল। বৃটিশ বণিক সাম্রাজ্যের চেয়ে বাণিজ্যের সাম্রাজ্যকে বড় করিয়া দেখিলেন এবং শেষ পর্যন্ত কুটনীতি বিশারদ ইংরাজ উপলব্ধি করিলেন ভারতীয় বিপ্লব ক্রমশঃ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। সুতরাং আপোষ মিমাংসার দ্বারা স্বাধীনতা স্বীকৃতি লাভ করিল। ভারতীয় সাম্রাজ্যের বিনিময়ে ইংরাজ ভারতীয় বন্ধুতা অর্জন করিলেন। লর্ড লুই মাউন্টব্যাটনের মুখে জয়হিন্দ উচ্চারিত হইল। আমরা স্বাধীন হইলাম।

এই স্বাধীন ভারতবর্ষকে আমরা গড়িয়া তুলিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে তাহা বহু বিঘ্ন ও বিপদের দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। নেটিভ প্রিন্সদের সমস্যা হইতে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন পর্যন্ত বহু দুরতিক্রম্য সমস্যায় আমরা ভারাক্রান্ত ছিলাম। ইহার মধ্যে অনেকগুলি সমস্যার আমরা মীমাংসা করিয়াছি, অনেকগুলি এখনও আমরা পারি নাই। প্রথম পঞ্চবার্ষিক ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ভারতবর্ষের মৌলিক সমস্যাগুলির মীমাংসার পথে অগ্রসর হওয়া। বহু শতাব্দী ধরিয়া আমরা ছিলাম কৃষিকেন্দ্রিক ও গ্রামকেন্দ্রিক দেশ। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতিগুলি যখন নব্য বিজ্ঞানের অজস্র আবিস্কারের দ্বারা যন্ত্রশিল্পে ও কারিগরি বিদ্যায় দেশে জন্মান্তর ঘটাইয়াছে, যখন শ্রম-শিল্পের বিপ্লবের দ্বারা কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদের ঐশ্চর্যকে মানুষের

ঐহিক জীবন যাত্রার সমৃদ্ধিতে প্রয়োগ করিয়াছে, তখন আমরা গত দুই শত বৎসর ছিলাম বিজ্ঞান ও কারিগর বিদ্যার বাহিরে—মূলতঃ গ্রামের কুটীরে ও ক্ষেতের কাজে। যতটুকু 'দুধ' আমরা ইহার ফলে পাইয়াছি, ইংরেজ শাসক ও বণিকেরা তার সবটুকু খাইয়াছেন এবং আমাদের বরাতে জুটিয়াছে কেবল জলীয় অংশ। দেশব্যাপী দারিদ্র, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও অস্বাস্থ্য যে কোন চিন্তাশীল মানুষের করুণা উদ্রেক করিবে। এই মর্ম্মান্তিক দুরাবস্থা হইতে আজ আমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে। গত দশ বৎসরে সেই চেষ্টা আমরা করিয়াছি। বিজ্ঞানের গবেষণাগার, নদীর বাঁধ, পল্লীর উন্নয়ণ, কৃষির ফলন বৃদ্ধি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জল সেচন, স্কুল-কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি, হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের চেষ্টা ইত্যাদি বহুদিকে কর্মের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে ইউরোপ, মার্কিণ দেশগুলির তুলনায় আমরা এখনও বহু পিছনে—অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পিছনে পড়িয়া আছি। সুতরাং ভারতীয় গণতন্ত্রকে স্বার্থক করিতে হইলে এই বাস্তব অবস্থা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে। কেবল হাঙ্গামা ও হৈ-চৈ না বাঁধাইয়া আমাদের উচিত হইবে সংগঠনের দিকে মন দেওয়ার—মৌলিক সমস্যাগুলির প্রতিকারের জন্য আন্তরিক চেষ্টার।

স্বাধীনতার উদ্দেশ্য কেবল স্বাধীনতা নয়। জীবনের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির প্রশ্নকে ত্বরান্বিত করাই স্বাধীনতার অন্যতম উদ্দেশ্য। যদি আগের মতই কোটি কোটি মানুষ চরম দুর্দশার মধ্যে জীবন কাটাইতে বাধ্য হয়, তবে কেবল ভৌগলিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাই একমাত্র সান্ত্বনার বিষয় হইবে না। খালি পেটে স্বাধীনতার চীৎকার শূন্য পাত্রের আর্ত ধ্বনির মত শুনাইবে। সুতরাং দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের বিরুদ্ধে আমাদের লড়িতে হইবে। আসুন, সেই সঙ্কল্প আমরা গ্রহণ করি—এই ভারতবর্ষকে সৌন্দর্যে স্বাস্থ্যে, শক্তিতে ও সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল করিয়া

তুলিবার মহৎ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। গত দশ বৎসরে যতটুকু আমরা করিতে পারিয়াছি, সততা, শৃঙ্খলা ও কর্তব্য নিষ্ঠার দ্বারা যেন তার চেয়ে চতুর্গুণ আমরা ভারতবর্ষের কোটি কোটি দরিদ্র নরনারী জীবনের অভিশাপমুক্ত হউক—দেবতার প্রসন্ন আশীর্বাদ এই জাতির ললাটে বর্ষিত হউক। জয়হিন্দ্ !!



স্বাধীনতা দিবস

ভারতীয় মহাবিদ্রোহের শতবার্ষিকী উৎসবের মধ্যে আসিয়াছে এবারের স্বাধীনতা দিবস। ১৮৫৭ সালের প্রথম মুক্তি-সংগ্রামের পর হইতে শতবর্ষের সাধনায় ভারত বৃটিশ-দাসত্বের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। শতবর্ষ ধরিয়া ভারতের শত সহস্র শহীদ স্বাধীন ভারতের যে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহার বাস্তব রূপদানে দেশ কতখানি সফল হইয়াছে তাহারও হিসাব নিকাশ করিতে হইবে আজিকার শুভ মুহূর্তে।

অতলস্পর্শী আত্মত্যাগের গরিমায় মহান শহীদদের পুণ্যস্মৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া আজ দেশবাসী স্বাধীনতা-দিবস উদ্‌যাপন করিতেছেন। মুক্তি সংগ্রামের বীর সৈনিকদের আদর্শের কথা স্মরণে রাখিয়া, ভারতের গৌরবোজ্জল সংগ্রামগুলির লক্ষ্যের প্রতি অবিচল থাকিয়া আজ আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকিতে হইবে।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের অন্তরে স্বাধীন ভারতের যে কল্পনা জাগরূক আছে তাহা কি প্রতিনিয়ত বাস্তবে প্রতিফলিত

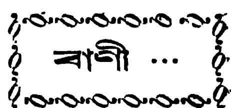
হইতেছে? স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন স্তর ও শ্রেণীর মানুষ কি চির আকাঙ্খিত জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে? সাম্রাজ্যবাদী-শৃঙ্খল মুক্ত ভারতের মানুষ স্বাধীনতা প্রাপ্তির গৌরব অনুভব করার সাথে সাথে আজ কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছে না স্বাধীন ভারতের গ্লানিকর চিত্রের কথা। আজিও ভারতের বুকে ব্রিটিশ পুঁজির শোষণ বর্তমান। এখনো ভারতের মাটি গোয়াতে দস্যু পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনো ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুক্তি যুদ্ধের বহু সৈনিক কারালঞ্ছনা ভোগ করিতেছেন, মুক্তি-সংগ্রামের শতবার্ষিকীর উৎসব-মুখর দিনগুলিতেও তাহাদের সকলকে মুক্তি দেওয়া হইল না! সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে আর্থিক দুঃখ-যন্ত্রণা হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পাইতেছে। বৃহৎ শিল্পপতি ব্যবসায়ী প্রমুখ কায়েমী স্বার্থের সীমাহীন মুনাফা লিপ্সাকে আজো সংযত করা হয় নাই। ব্রিটিশ আমলে সাম্রাজ্যবাদী পশুশক্তির পদলেহনে যাহারা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিত সেই দেশীয় নৃপতির দল অসংখ্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি আজও স্বাধীন ভারতে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে যাহারা শত্রুতা করিয়াছিল তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় নাই। দেশবাসীর মার্জ্জনা তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি কংগ্রেসী শাসনে তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে বিগত দিনের দেশদ্রোহিতার অভিনব পুরস্কার। আর, তাহারই পাশে মুক্তি সংগ্রামে যে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত জনসাধারণ অত্যাচার নির্যাতনকে তুচ্ছ করিয়াছিল তাহাদের ভাগ্যে জুটিয়াছে অনশন, অর্দ্ধাশন; অন্নবস্ত্র, বেতন, ভাতা দাবি করিলে তাহার পায় দমননীতির কশাঘাত। স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী গণতন্ত্রের কি বিচিত্র বিচার!

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চাই; কিন্তু কোটিপতি দেশী বিদেশী মুনাফাখোরদের হৃদয়হীন শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নিষিদ্ধ! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে, দেশের মুক্তি আন্দোলনের যে বজ্রঘোষণা

একদিন আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করিয়াছিল, কংগ্রেস আন্দোলনের মঞ্চ হইতে যে লক্ষ্যগুলি বারে বারে ধ্বনিত হইয়াছিল সেগুলি স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী শাসকরা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে ডুবাইয়া দিতে চাহিতেছেন।

কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির বিগত দশটি বৎসরের শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাহা সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে স্বাধীন ভারতে দুইটি সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলাফল বিচারে দেখা গেল এই জনস্বার্থ-বিরোধী নীতির ফলে কংগ্রেসের যে প্রতিষ্ঠা জনমানসে ছিল তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত নির্বাচনে প্রমাণিত হইয়াছে—দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি, সরকার বিরোধী প্রগতিশীল শক্তি প্রভুত পরিমাণে বলসঞ্চয় করিয়াছে। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে কংগ্রেসের জনস্বার্থ পরিপন্থী নীতির বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তিপুঞ্জ আগাইয়া আসিতেছে। সারা ভারতের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি বৃদ্ধির শীর্ষে দাঁড়াইয়াছে কেরালা রাজ্যে কমিউনিস্ট সরকার—এই সরকার গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতিভূরূপে কংগ্রেসী শাসনের জনস্বার্থ বিরোধী নীতিগুলিকে চ্যালেঞ্জ করিতেছে। এবারকার স্বাধীনতা দিবসে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহনকারী এই শক্তিকে স্বাগত জানাইবে দেশের শোষিত, বঞ্চিত, লাঞ্ছিত মানুষ।

শান্তির পতাকাবাহী স্বাধীন ভারত বিশ্বের দরবারে মর্য্যাদার আসনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। দেশের পুনর্গঠনে, দেশের স্বাধীনতা ও সার্ব্বভৌমত্বকে সুরক্ষিত করার সংগ্রামে, সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য ও আদর্শে পৌঁছিবার উদগ্র কামনায় অবিচল ভারতবাসী এবারকার স্বাধীনতা দিবসে নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া সংকল্প গ্রহণ করিবে—সারা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া সকলে মিলিয়া ভারতের সুমহান ভবিষ্যতকে গড়িয়া তুলিবে। স্বাধীন ভারত দীর্ঘজীবি হউক।



নবীন সৃষ্টির গুরুদায়িত্ব মাথায় করে আমরা আজ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হব। বিধাতা আমাদের তরুণ প্রাণে সৃষ্টি শক্তির প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের জীবনের সমস্ত উন্মাদন, সকল ভাবুকতার মধ্যে আমরা যেন আজ এই কথা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি যে, আমরা ছোট নই—আমরা বড়, নইলে সমস্ত ম্রিয়মান ধ্বংসোন্মুখ উপাদানের এই নব সৃষ্টির দুরুহ ভার বিধাতা আমাদের উপর দিলেন কেন ?

মনুষ্য জীবনের পরম সার্থকতা সৃষ্টির আনন্দে, আমরা আজ সেই সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করবার জন্য আমাদের সমস্ত কর্মশক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করব।

পরোপকারের হীন আত্মপ্রসাদ লাভের জন্য নয়, পতিত জাতির উদ্ধারের অহঙ্কারের জন্য নয়, কর্ম-কর্তৃত্বের আত্মম্ভরী জ্ঞান হতে নয়—আমরা আমাদের মিলিত শক্তির দ্বারা, সমবেত চেষ্টার দ্বারা যে সেবাব্রত উদ্‌যাপন করব তা শুধু নিজেদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনের জন্য, আত্মবিস্মৃত পুরুষ সিংহের জাগরণের জন্য, মথিত নর-নারায়ণের উদ্বোধনের জন্য, অনাদিকাল হতে ভারতবর্ষের যে মহান্ আদর্শ পরসেবাব্রতে প্রারব্ধ হয়েছে, তা এই সেবাব্রতেই উদ্‌যাপিত হয়ে আমাদের সিদ্ধির পথে অগ্রসর করে দেবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৫৮

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

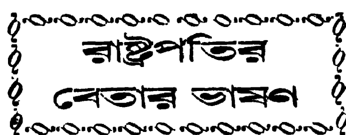
....

- বাণী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা আমরা পেলাম! কিন্তু এই স্বাধীনতার মধ্যে কেমন যেন একটা বড় জিজ্ঞাসা ক্রমশঃই বিবেককে আলোড়িত করছে। বৃটিশরা শাসন ক্ষমতা আমাদের নায়কদের হাতে তুলে দিলেন। শাসনভার নেওয়ার পর দেখা গেল সাধারণ মানুষের জন্য যে স্বাধীনতা—তা তাঁরা ভুলে গেলেন। নায়করা স্বাধীনতা দিচ্ছেন, ধনী-প্রভুদের, কুখ্যাত বিদেশীদের—যারা বছরের পর বছর আমাদের মা-ভাই-বোনদের অসম্মান করেছে, যাতনা দিয়েছে, হত্যা করেছে—যে বিদেশীদের দ্বারা আমরা বহু বছর পরাধীন ছিলাম তাদের ব্যবসা বাণিজ্যই কি স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও ভারতে প্রাধান্য লাভ করবে—? আমরা আবার কি পরাধীন হতে যাচ্ছি না?

দেশ স্বাধীন—জনগণ অধিকার আদায় করবেই

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি

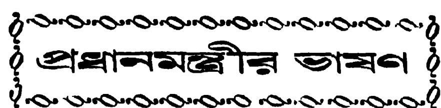


স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য প্রভাতে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী ভারত গঠনের সংকল্প গ্রহণ

কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অকুতোভয়ে অগ্রসর হইতে দেশবাসীকে আহ্বান

বাঙ্গালোর, ১৪ই আগস্ট—স্বাধীনতা দিবসে ভারতের জনগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন : "এই পবিত্র দিনটি যেমন আমাদের আনন্দের সেইরূপ আত্মোৎসর্গেরও বটে। ভারতে যত সত্বর সম্ভব কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সার্থক করার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এবং সমস্ত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া দেশের বহুমুখী উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইতে আসুন আমরা সকলে সঙ্কল্প করি।"

তিনি বলেন "কেহ কেহ মনে করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্য অসম্ভব রকমের বড়, আবার কাহারও মতে দেশবাসীগণের প্রয়োজনের তুলনায় তাহা যথেষ্ট নহে। এই উভয় মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ তাঁহারা নিজ নিজ মত আঁকড়াইয়া না থাকিয়া জাতির সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করুণ।"



ভারতের একতা ও স্বাধীনতা যে ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিবে ভারত তাহাকে দমন করিবে

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—অদ্য স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার হইতে ঘোষণা করেন যে, "কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সমস্ত দেশবাসীকেই ভারতের একতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অভ্যন্তরীণ ও রাষ্ট্রবহির্ভূত সমস্ত প্রকার বিরুদ্ধ শক্তিকে দমন করিতে হইবে।"

তিনি বলেন, "ইহা যেন সকলেই বেশ স্বচ্চভাবে বুঝিতে পারেন যে, যে কেহই ভারতের বিরুদ্ধাচারণ করিবেন বা ভারতের একতা ক্ষুণ্ণ করিতে চাহিবেন, ভারত তাহার সম্মুখীন হইবে এবং তাহাকে দমন করিবে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের যুবক সমাজের সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যত রহিয়াছে। তাহাদের উপযুক্ততা যথেষ্ট। তবে বৃহৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তাহাদিগকে এখন হইতে প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু সামান্য বিবাদ বিসম্বাদে জড়াইয়া পড়িলে তাহারা কিছুই করিতে পারিবে না।"

আনন্দ বাজার পত্রিকা

পনরই আগস্ট

আজ পনরই আগস্ট—রাজনৈতিক রাহুগ্রস্ত জাতির শুভমুক্তি-দিবস। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে সুদৃঢ় লৌহবলয় কিঞ্চিন্ন্যূন দীর্ঘ দুই শত বর্ষ ধরিয়া ধীরে ধীরে জাতির প্রাণ সত্তাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া নিষ্পিষ্ট করিতেছিল, বিশ্বের মুক্ত আলো ও বাতাস হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহার শ্বাসবায়ু হরণ করিয়া লইতেছিল, বাষ্পীয় আবেষ্টনীর মত তাহা বাতাসে বিলীন হইয়া যায় এই দিনটিতে। যে বিশাল সাম্রাজ্য তিল তিল করিয়া গড়িয়া তুলিতে ইংরাজ জাতির সার্ধশত বৎসরের অধিককাল লাগিয়াছিল, আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার অধিকার হস্তান্তরিত করিতে তাহাদের পনের মিনিটের বেশী সময় অতিবাহিত হয় নাই। কিন্তু স্বল্পক্ষণ ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে সুদীর্ঘ ইতিহাস আস্তৃত রহিয়াছে, হস্তান্তর নামা পরিশিষ্ট হিসাবে তাহার সহিত গ্রথিত অতি সংক্ষিপ্ত ক্রোড়পত্র মাত্র।

স্মরণ রাখিতে হইবে, ইতিহাসের ধারা কোথাও অবরুদ্ধ বা অবলুপ্ত হয় না, প্রবাহিত হইবার জন্য তাহা প্রয়োজনমত নূতন খাত আশ্রয় করে। ঐতিহাসিক এই নিয়মের অলঙ্ঘ্য নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ধারাও এক নূতন খাত আশ্রয় করিয়া তাহার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে কখনও মন্থর গতিতে, আবার অন্য কখনও বা দ্রুতবেগে দশটি বৎসর ধরিয়া বহিয়া আসিয়াছে, তাহার

পশ্চাতে প্রসারিত রহিয়াছে মুক্তিকামী জাতির জীবনপণ স্বাধীনতা-সংগ্রামের সবল অনুপ্রেরণা এবং তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করিতেছে সেই চরম ও পরম লক্ষ্য—যাহা লাভ করিতে না পারিলে "স্বাধীনতা" শব্দটিই অর্থহীন ও অবাস্তর হইয়া যায়। পশ্চাতে অতীতের বিশাল ইতিহাস এবং সম্মুখে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনা—এতদুভয়ের মাঝখানে সংযোগের সেতু রচনা করিয়াছে পনরই আগস্টের সংক্ষিপ্ত পরিশিষ্টটি। কাজেই পনরই আগস্ট আমাদের জাতীয় অভিযান পথের চরম লক্ষ্য নয়, লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথে তাহা প্রথম পাদবিক্ষেপ।

সূচনা স্থল হইতে যাত্রা করিয়া জাতি একাদশ বর্ষীয় পথপরিক্রমায় পদার্পণ করিল। একটা জাতির জীবনে দশ বৎসর অবশ্য সময়ের দিক হইতে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যাপ্তিকাল নয়। কিন্তু ইহা স্বাভাবিক সময়ের উপযোগী সাধারণ নিয়মমাত্র এবং আমরা বাস করিতেছি একটা অত্যন্ত অস্বাভাবিক কালপরিসরের মধ্যে। ঘটনাস্রোত এখানে বহিয়া চলিয়াছে এমন উদ্দাম গতিতে যে, তাহার আঘাতে কাল সমুদ্রের জল হইয়া উঠিয়াছে উত্তাল ও তরঙ্গবিক্ষুব্ধ। মানব প্রগতির ধাবমান শকট তাহার বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক বাহন পরিহার করিয়া বাহনরূপে আপন অগ্রে স্থাপন করিয়াছে আণবিক শক্তির অপরিমেয় গতিবেগসম্পন্ন অশ্বযুগলকে। মানুষের নিক্ষিপ্ত রকেট জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত অবিশ্বাস্য বেগে পৃথিবীকে আবর্তন করিয়া চলিয়াছে; মনুষ্যনির্মিত বিমান পক্ষবিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে গ্রহান্তরের উদ্দেশে, লক্ষ্য করিবার বিষয়, রকেট শুধু অন্ধবেগে আবর্তিতই হইতেছে না, পরন্তু মহাজাগতিক রহস্যাগারের দুর্জ্ঞেয় বিস্ময়রাজি লুণ্ঠন করিয়া সাঙ্কেতিক শব্দতরঙ্গের সাহায্যে তাহা বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বিজ্ঞাপিত করিতেছে।

যুগীয় গতিবেগের এই মাপকাঠি দিয়া যদি আমরা আমাদের দশ বৎসর সময়ের মধ্যে অতিক্রান্ত দূরত্বের পরিমাপ করি, তাহা হইলে অর্জিত কৃতিত্বের পরিমাণ সম্বন্ধে হতাশ না হইয়া পারি না। রাষ্ট্রীয়

শকটের পরিচালন ব্যাপারে সরকারী সেরেস্তার অকর্মণ্যতা আছে, শৈথিল্য ও দীর্ঘসূত্রিতা আছে এবং সে সূত্রের দৈর্ঘ্যকে দিনে দিনে দীর্ঘতর করিবার জন্য আছে অবশ্য প্রয়োজনীয় শিল্প ও পরিকল্পনা সংস্থাসমূহে মুহুর্মুহু সংঘটিত শ্রমিক বিক্ষোভ, কর্মবিরতি ও তাহার ফলে উৎপাদন হ্রাস এই শ্রমিক বিক্ষোভের অপরিহার্য পরিণতি। বিশ্বের প্রগতিশীল জাতিসমূহের যে শোভাযাত্রা চলিয়াছে পৃথিবীর পথের উপর দিয়া সুদীর্ঘ সে শ্রেণীর মধ্যে আমাদের স্থান কোথায়? সে শোভাযাত্রার প্রান্তসীমাস্পর্শ করিতে হইলে ভারতীয় প্রগতি রথকে দ্রুততর গতিবেগ অর্জন করিতে হইবে, বর্জন করিতে হইবে গতিপথের পদে পদে প্রতি-বন্ধক সৃষ্টির প্রমাদজনক মনোভাব। ভারতের শুধু আপনি আগাইয়া গেলেই চলিবে না; সভ্যতার শোভাযাত্রায় পুরোধা যাহারা, অর্জিত শক্তির মাদকতা তাহাদের শোণিতে সর্বনাশের নেশা ধরাইয়া দিয়াছে এবং তাহারই তাড়নায় ক্ষিপ্ত হইয়া পুরোগামী শোভাযাত্রী দল উদ্দামবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে আসন্ন বিনাশের অতলস্পর্শী গহ্বর অভিমুখে। ভারতকে এক হাত দিয়া দ্রুততর বেগে চালিত করিতে হইবে জাতীয় ও জাগতিক কল্যাণের পথে আপনার প্রগতির রথকে এবং অন্য হাত দিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে উন্মার্গগামী রাষ্ট্রীয় শকট সমূহের উদ্ধত অশ্ব-বল্গা। আসন্ন পনরই আগস্টের উপকণ্ঠে দাঁড়াইয়া আসুন আমরা সমবেত কণ্ঠে এই শুভেচ্ছা উচ্চারণ করি: বিশ্বের যে রাজপথ আজ বিপদসঙ্কুল ও কণ্টকাকীর্ণ আগামী পনরই আগস্টের সম্মুখে তাহা প্রসারিত হোক কুসুমাস্তীর্ণ কল্যাণের পথরূপে। জয়হিন্দ্‌!

দৈনিক বসুমতী

১৫ই আগস্ট

ইংরেজের দত্ত খণ্ডিত ভারতের "স্বাধীনতা দিবস" যদি ইংরেজের ব্যবহৃত তারিখেই উদযাপিত হয়, তবে তাহাতে বিস্ময়ের কি কারণ থাকিতে পারে? বিস্ময়ের কারণ না থাকিলেও বিষাদের কারণ হয়ত আছে। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে—কিন্তু ১৫ই আগস্ট—১৫ই আগস্ট বলিয়াই প্রসিদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে। ইহাও দাস মনোভাবের পরিচায়ক কিনা; সে আলোচনা করা নিষ্ফল।

অখণ্ড ভারত—জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করাইয়া—খণ্ডিত করিয়া ইংরেজ তাহার শাসন ক্ষমতা দেশবাসীকে হস্তান্তরিত করিয়া গিয়াছে। যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদিগের নিত্যসাথী। কাশ্মীর সমস্যার কথা—খালের জল সমস্যার কথা—আসামে পাকিস্তানী আক্রমণ—পশ্চিমবঙ্গে পাকিস্তানী অত্যাচার—এ সকলের কথা আজ আর উত্থাপিত করিব না।

কারণ, স্বাধীনতা সম্বন্ধে বলা যায়—"স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" আর—

(১) সুশাসনও কখন স্বায়ত্তশাসনের স্থান অধিকার করিতে—অর্থাৎ তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না।

(২) স্বাধীনতাই মানুষকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করিতে পারে ও করে।

বাঙালীর পক্ষে এই ১৫ই আগস্ট একাধারে দুঃখের ও সুখের দিন। সেই জন্যই ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে খণ্ডিত ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া—অখণ্ড স্বাধীন ভারতের জন্য সর্ব্বত্যাগী অরবিন্দ লিখিয়াছিলেন—

"India is free, but she has not achieved unity, only a fissured and broken freedom. But by whatever means the division must and will go."

যে বাঙ্গালী বাঙ্গলা বিভাগের প্রতিবাদে স্বাধীনতা সংগ্রাম করিয়াছিল—যে উপায়ে সর্বাপেক্ষা অল্প সময়ে ও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে দ্বিধানুভব করে নাই—"জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য" করিয়াছিল—সেই বাঙ্গলা যে বিভক্ত হইয়াছে তাহা নহে; পরন্তু স্বাধীনতার জন্য যে মূল্য অশ্রুতে ও শোণিতে দিতে হইয়াছে তাহা—অন্যান্য প্রদেশ না দিলেও—পাঞ্জাবের সহিত দিয়াছে সেই পশ্চিমবঙ্গ আজ দুঃখ-দুর্দশার সাগরে ভাসিতেছে।

এই দেশ বিভাগ যাঁহাদিগের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া করা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে আজ দুইজনের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করিতে হয়ঃ—

(১) যে বাঙালী তরুণ তাঁহার কতকগুলি স্বদেশী বিশ্বাসঘাতকের ও বিদেশী সরকারের জন্য গোপনে মাতৃভূমি হইতে পলাইয়া যাইয়া—ইটালীর প্রণষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য যাহা প্রয়োজন হইয়াছিল—ম্যাটসিনীর প্রেরণা, গ্যারিবল্ডীর বাহুবল ও কাভুরের রাজনীতি—সেই তিনের সমন্বয় করিয়া রাসবিহারীর হস্ত হইতে কার্য্যভার লইয়া—ভারতীয় জাতীয় সেনাদল গঠিত করিয়া বাঙলার সীমান্তে কোহিমায় স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া গিয়াছিলেন—সেই বীর সুভাষচন্দ্র বসু।

(২) যিনি অহিংসার পথে গণ-আন্দোলন পরিচালিত করিয়া নূতন ভাবে—নিরস্ত্র জাতির জন্য পরিকল্পিত উপায়ে ভারতে

স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন—সেই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। তিনি—পরে যাহাই কেন মনে করিয়া থাকুন না এবং যে কারণেই তাহা মনে করিয়া থাকুন না—স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছিলেন—দেশ বিভাগ পাপ ও অপরাধ।

সে যাহাই হউক, আজ খণ্ডিত ভারত স্বায়ত্ত-শাসন পাইয়াছে। এই পথে সে তাহার নিয়তি নির্দিষ্ট স্থানে উপণীত হইতে পারিবে। ইংরেজ ভারতবাসীর স্বাধীনতার জন্য আগ্রহের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না—

"That form of patriotism which causes a small poverty—stricken state to prefer to govern itself, however badly, rather than form an integral part of a great and powerful empire seems irrational and impracticable to the mind of an average Englishman, who is essentially utiliterian and unemotional in his ideas of practical policy."

ভারত দীর্ঘকাল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে—মোরাস জোকাই বলিয়াছিলেন—স্বাধীনতা যখন নবপ্রসূত হয়, তখন তাহাকে পান দিয়া পুষ্ট করিতে হয়—সে যদি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে রক্ত চাহে, তবে উপায় কি?

সাধারণ লোক আজও অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইতে অব্যাহতি পায় নাই—এখনও শিক্ষার অভাব ও স্বাস্থ্যের অভাব সর্বত্র লক্ষিত হয়। হয়ত অভাব প্রবলতর হইয়াছে। কিন্তু তবুও স্বাধীনতা—স্বাধীনতা। যাঁহারা ক্ষমতা পাইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, তাঁহারা হয়ত নানারূপ ভুল করিতেছেন। কিন্তু তাঁহারা চিরস্থায়ী নহেন। তাঁহাদিগকে প্রয়োজনে ক্ষমতাভ্রষ্ট করিবার অধিকার দেশের লোককে স্বাধীনতাই দিয়াছে। সেইজন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন বলিয়াছেন—

দেশ ও দেশের সব প্রতিষ্ঠান দেশের অধিবাসীদিগের। যখনই তাঁহারা কোন কারণে সরকারের কাজে বিরক্তি অনুভব করে, তখনই

তাহারা নিয়মানুগ অধিকারের দ্বারা সরকারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে বা বিপ্লবীয় অধিকারে সরকারের পতন ঘটাইতে পারে।

তাহা দেশের অধিবাসীদিগের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার আজ ভারতবাসী—দীর্ঘকালের চেষ্টায়—লাভ করিয়াছে। ইহা পরমলাভ।

আজ বাঙ্গালীকে তাহার কর্ত্তব্য বিশেষভাবে বিবেচনা করিতে হইবে। কারণ জাতীয়তার—নব জাতীয়তার পাবনীধারা বাঙ্গলার গোমুখীমুখ হইতেই নির্গত হইয়াছিল। সেই জন্যই লালা লাজপত রায় বলিয়াছিলেন—বিধাতার বিধান—বাঙ্গালী ভারতে নবযুগ প্রবর্ত্তিত করিবে। আর সেই জন্যই বালগঙ্গাধর তিলক বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের জাতির মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র "বন্দেমাতরম" শিবাজীর সমাধিতোরনে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন।

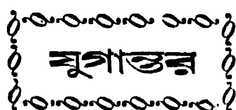
বাঙ্গালীর এই স্বাধীনতায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কর্ত্তব্য আছে।

রামকৃষ্ণের বাঙ্গলা, রামমোহনের বাঙ্গলা, বিবেকানন্দের বাঙ্গলা, বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গলা, রবীন্দ্রনাথের বাঙ্গলা, অরবিন্দের বাঙ্গলা, সুভাষচন্দ্রের বাঙ্গলা সে কর্ত্তব্য পালন করিতে দ্বিধানুভব করিবে না—সেজন্য যে ত্যাগ প্রয়োজন, অনায়াসে সে ত্যাগ স্বীকার করিবে।

আমাদিগকে দৃঢ়পদে বিঘ্ন কঙ্করকণ্টকিত পথ অতিক্রম করিয়া গম্যস্থানে উপনীত হইতে হইবে—তাথায় মাতমন্দিরের রুদ্ধদ্বার "বন্দেমাতরম" মন্ত্র উচ্চারিত হইলে মুক্ত হইয়া যাইবে। তখন বাঙালী সোল্লাসে সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রদ্ধার রত্নবেদী নিষ্ঠার গঙ্গোদকে ধৌত করিয়া তাহার উপর মা'র মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবে—দশভূজা সিংহপৃষ্ঠারূঢ়া অসুর-নিধনরতা—সঙ্গে বিদ্যাবিজ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, ধনধান্যদায়িনী লক্ষ্মী, বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণপতি। বাঙ্গালী তাহার মণীষার পঞ্চপ্রদীপ অনুশীলনের গব্যঘৃতে পূর্ণ করিয়া তাহার আলোকে মা'র পূজা করিবে।

বাঙ্গালী সমগ্র ভারতের অধিবাসীদিগকে সেই পূজায় যোগ দিয়া সমস্বরে পূজার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আহ্বান করিবে—

বাহুতে তুমি মা শক্তি
অন্তরে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
বন্দে মাতরম!



১৫ই আগস্ট

আজ হইতে ১১ বছর আগে ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসন মুক্ত হইয়াছে। ১৫ই আগস্ট তারিখটি এজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্মরণীয়। পলাশীর যুদ্ধের ঠিক ১৯০ বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে বৈদেশিক দাসত্ব হইতে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেও ইহা অনেকের নিকট বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। বৃটিশসিংহ তার বজ্রমুষ্টি ভারত সাম্রাজ্যের উপর শিথিল করতে বাধ্য হইবে, এই ধারণা তখনও তেমন স্পষ্ট ছিল না। এজন্য অনেকের কাছে স্বাধীনতা আসিয়াছে অকস্মাৎ একটা "দানের" মত, যার জন্য আমাদের মধ্যে অনেকে বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। এই স্বাধীনতা অর্জনের পিছনে জনসাধারণের ত্যাগ স্বীকার সর্বাধিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ সাধারণ সৈনিক হিসাবে তাঁরা লড়াইয়ে সর্বোত্তম অংশগ্রহণ করিয়াছেন—জীবন দান করিয়াছেন, রক্ত দান করিয়াছেন এবং অশ্রু দান করিয়াছেন। তাঁরা সাধারণ কেরাণী-কর্মচারী-মজুর-চাষী-কারিগর শ্রেণী হইতে উদ্ভূত। এই পবিত্র দিনে সেই অজ্ঞাতনামা সাধারণ সৈনিকদের স্মরণ করি। আর স্মরণ করি

বাঙলার বীর সন্তানদের, যাঁরা উনবিংশ শতক হইতে মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নবযুগ জীবনবার্তা বহন করিয়া আনিয়াছেন—যাঁদের প্রেরণায় বাঙলার নীল বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ হইতে শুরু করিয়া শিক্ষা, সংবাদপত্র, সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্তরে নতুন মানবতার বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিত হইয়াছিল। সেই সমস্ত কর্মী, নেতা, মণীষী ও চিন্তানায়ককে আজিকার এই পুণ্য দিনে প্রণাম জানাই, যাঁরা রাজনীতিতে, সমাজ নীতিতে, ধর্মনীতিতে এবং অর্থনীতিতে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আনিয়াছেন—বিপ্লবের অগ্নিকণা চারিদিকে ছড়াইয়া দিয়াছেন এবং যে অগ্নিকণা হইতে নবীন ভারতবর্ষের বিষণ্ণ মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, প্রদীপ্ত হইয়াছে, প্রণাম জানাই সেই সমস্ত বিদ্রোহীকে, যাঁরা নারীদের মুক্তি দিয়াছেন—কুসংস্কার, অজ্ঞতা, নিপীড়ন ও শোষণ হইতে নতুন মানবীয় অধিকারের মুক্তির জগতে পথ দেখাইয়াছেন। প্রণাম জানাই সেই সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহীকে, যাঁরা বৃটিশ দাসত্বের শৃঙ্খল অকুতোভয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া এই বৃহৎ ভারতবর্ষকে স্বাধীনতার জন্মগত অধিকারে প্রতিষ্ঠা দিয়াছেন। জাতীয় আন্দোলনের পুরোধাদিগকে সর্বভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বীরযোদ্ধাদিগকে এবং অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, তিলক ও সুভাষচন্দ্রকে সমগ্র জাতির পক্ষ হইতে আজ শ্রদ্ধা জানাই।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। কিন্তু এই ক্ষমতা হস্তান্তর কিম্বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন অবিমিশ্র আনন্দের ছিল না। পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এই অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক তাণ্ডবে জনসমাজ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। রক্তপাত, অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় ইতিহাসের কতকগুলি পৃষ্ঠা কলঙ্কিত হইয়াছে এবং মূলনীতি বিসর্জিত হইয়াছে কিম্বা আপোষ রফার দ্বারা সংখ্যালঘু সমস্যার মীমাংসা করিতে হইয়াছে। মুস্লিম সমাজের বৃহত্তম অংশ পৃথক ও স্বাধীন পাকিস্তানে পরিণত হইয়াছে—গান্ধী ও জিন্না দুই পৃথক অন্নের পরিবারে বিভক্ত

হইয়া গিয়াছেন। ইহা তিক্ত সত্য এবং এই নিষ্ঠুর সত্যের জন্য যেমন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ দায়ী, তেমনি দায়ী ছিল আমাদের হিন্দু-মুস্লিম নেতৃত্ব এবং সেই নেতৃত্বের অধীন রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি। কংগ্রেস ও মুস্লিম লীগের পিছনে জনমতের যে বৃহত্তম অংশের সমর্থন ছিল, সেই জনমতও এই পার্টিশানের জন্য দায়ী—দায়ী আজিকার দুর্ভোগ ও জীবনযন্ত্রণার জন্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসের দান সর্বাধিক, একথা সত্য। কিন্তু একমাত্র গান্ধীজীর কিম্বা একমাত্র কংগ্রেসের জন্যই স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, এই দাবী সর্বাংশে সত্য নহে। বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন হইতে স্থুরু করিয়া নেতাজী স্থভাষচন্দ্র কর্তৃক ব্রহ্ম সীমান্তের সংগ্রাম, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের পতন, ভারতীয় সৈন্য দলের মধ্যে বিদ্রোহাত্মক মনোভাবের প্রসার ও প্রকাশ, বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের রাজপথে যুব সমাজের লড়াই এবং শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড গণ-বিক্ষোভের বিস্তৃতি—এই সমস্ত মিলিয়াই বৃটিশ শাসকদের শক্তি খর্ব ও দম্ভকে চূর্ণ করিয়াছে। বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয় নাই, একমাত্র অহিংসার দ্বারাই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নত হয় নাই—স্বাধীনতার আগে এবং পরে অন্ততঃ এক-লক্ষ নরনারী এই ভারতবর্ষে ভাতৃদ্রোহিতার দ্বারা হতাহত হইয়াছে, অসংখ্য পরিবার ছারেখারে গিয়াছে, ধর্ম এবং অধর্ম মিলিয়া পরস্পরের বুকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে। স্থতরাং স্বাধীনতা বিনা রক্তপাতে আসে নাই।

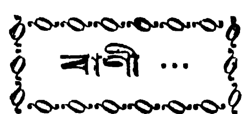
১৫ই আগস্ট তারিখে আমরা কাগজে কলমে স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি। বৃটিশ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া দেশীয় শাসনের অধীন হইয়াছি—আমাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই আজ রচনা করিবার অধিকার পাইয়াছি। কিন্তু আজও আমাদের ত্রুটি, দুর্বলতা এবং অক্ষমতা অসংখ্য। গত ১১ বছর এই সমস্ত ত্রুটি এবং দুর্বলতার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করিয়াছি, কিন্তু আজও সাফল্য অর্জন

করিতে পারি নাই। অবশ্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক কাজ গত কয়েক বছরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা এই ভারতবর্ষকে একটা ঐক্যবদ্ধ সংহত রাষ্ট্রে পরিণত করিয়াছি—দেশীয় রাজ্য বা নেটিভ্ ষ্টেট্ গুলিকে আমরা শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং সাফল্যের সঙ্গে লোপ করিয়াছি, যার জন্য জাতীয়তাবাদী ভারতবর্ষ চিরদিন সর্দার প্যাটেলের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। বৃটিশ শাসকগণ একদিকে মুশ্লিম এবং অন্যদিকে নেটিভ্ ষ্টেট্—এই দুই দিক হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্ততঃ এই পাপ হইতে আমরা দেশকে রক্ষা করিতে পারিয়াছি, যার ফলে ভারতবর্ষ আজ ঐক্যবদ্ধ সংহত রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্ল্যানিং অনুসরণ করিতেছি। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা হইতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে আমরা সংগঠনের চেষ্টা করিতেছি এবং আশা করিতেছি এই সমস্ত পরিকল্পনার সাফল্যের দ্বারা আমরা ভারতবর্ষকে দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রার দৈন্য হইতে উদ্ধার করিতে পারিব। তৃতীয়তঃ পররাষ্ট্রীয় নীতিতে আমরা উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়াছি, যার জন্য আমরা আমাদের শ্রদ্ধাভাজন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কৃতজ্ঞ। আমরা নয়াচীন ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছি এবং পঞ্চশীলের নীতির প্রতিষ্ঠা দিয়াছি, উহার ফলে এশিয়া আফ্রিকার মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আসিয়াছে এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক দৌরাত্ম্য প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে আমাদের এই বন্ধুতা পূর্ব গোলার্ধে নূতন স্বাধীনতা ও জাতীয়তার শক্তি সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু নয়াচীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে এই মৈত্রী সত্ত্বেও আমরা আমেরিকা, বৃটেন বা পশ্চিমী জগতের সঙ্গে কোন শত্রুতার মনোভাব অবলম্বন করি নাই। এই সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গেও আমরা বন্ধুতা ও সহৃদয়তার সম্পর্ক বজায় রাখিতেছি এবং প্রয়োজন মত পূর্ব ও পশ্চিম, দুই দিক হইতেই

অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করিতেছি।

এখন আমাদের সম্মুখে সংগঠনের পালা। হুল্লোড়বাজী রাজনীতি, হট্টগোল ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া সমাজ ও দেশকে সংযতচিত্তে এবং বুদ্ধি খাটাইয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে—সংহার নয়, সংগঠন করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে আমাদের এই মহান ও পবিত্র দায়িত্ব। দারিদ্র, বেকারি, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং কুসংস্কার ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করিতে হইবে। আসুন এই পবিত্রদিনে, স্বাধীনতার পুণ্যতিথিতে জাতিকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আমরা সঙ্কল্প গ্রহণ করি—সংগঠনের ব্রতে নূতন দীক্ষা লাভ করি। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষ আমাদের জন্য অপেক্ষমান—আমাদের প্রতিভা, সততা, শক্তি, কল্পনা ও পরিশ্রমের জন্য অপেক্ষমান। আসুন আমরা জীবন সংগঠনের নূতন ব্রত গ্রহণ করি।

—জয়হিন্দ্ !!



যত বড় সমস্যা তত বড়ই তাহার তপস্যা হইবে, যাহা কালে কালে জমিয়া উঠিয়াছে তাহারই মধ্যে হাল ছাড়িয়া ডুবিয়া পড়িয়া ভারতবর্ষের চিরদিনের সাধনা এমন করিয়া চিরকালের মত হার মানিবে না। এরূপ হার মানা যে মৃত্যুর পথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

.......দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত, তবে যাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, যাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাঁহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কায়-মন-বাক্য যদি এক হয়, একমুষ্টি লোক পৃথিবীর রূপ বদলে দিতে পারে—এ বিশ্বাসটি ভুলো না। বাধা যত আসবে, ততই ভাল। বাধা না পেলে কি নদীর বেগ হয়! জিনিষ যত নতুন হবে, যত ভাল হবে, সে জিনিষ প্রথম প্রথম তত বেশি বাধা পাবে। বাধাই ত সিদ্ধির পূর্ব লক্ষণ! বাধাও নাই, সিদ্ধিও নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ

....আমাদের আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। আমরা আমাদের দেশের পুনর্জীবনের মহান কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছি, আমরা ভারতের জন্য এক নবযুগ আনয়ন করিতেছি, কাজেই আমাদের নতুন জীবনের ভিত্তি হইবে সুদৃঢ়। স্মরণ রাখুন ইহা ঢক্কা নিনাদ নয়। আমরা ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন দেখিতেছি।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৫৯

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- স্বাধীনতা*

....

- বাণী মহাত্মা গান্ধী

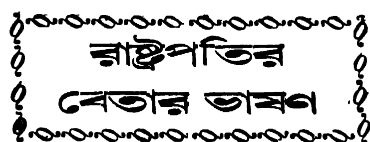
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তথাকথিত দেশীয় নেতারা সাধারণ মানুষের কাছে চিৎকার করে বলতেন, তাঁরা স্বাধীনতা পেলে দেশের কোন লোক অশিক্ষিত থাকবে না; অশিক্ষিত জাতি মানব সমাজের কলংক, অভিশাপ ইত্যাদি বলে জনগণকে বশে আনতেন। নেতারা স্বাধীনতা পেলেন। তারপর? এবার জনগণের চিৎকার। নেতারা ভোগবিলাসে, আরামে, আয়াসে, নিজেদের পুত্র কন্যাকে সুশিক্ষিত করে তুলছেন সাধারণ জনগণের পয়সায়। অথচ সাধারণ মানুষ মেহনত করেও তাঁদের পুত্রকন্যাকে শিক্ষিত করতে পারছেন না। ভারতীয় সংস্কৃতি গত পঁচিশ বছরে বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থার চাইতেও দুর্বল হয়ে পড়েছে। একথা আজ আর কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

এক একজন প্রধানমন্ত্রীর নামে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাতে দলীয় প্রাধান্যই বেশী; এই কি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির স্বরূপ?

যে দেশের বালককে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সময়েই রাজনীতির নোংরা খেলায় নামিয়ে দেওয়া হয় সে দেশের বালক শিক্ষিত হবে না নোংরা রাজনীতি শিখবে? ভারত ছাড়া আর কোন দেশে এটা সম্ভব?

দেশ স্বাধীন—শিক্ষা ব্যবস্থা দেশীয় হওয়া চাই

*অনেক প্রচেষ্টাতেও সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি।



দৈনন্দিন কার্যে ও চিন্তায় দেশকে সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে রাখিতে জনগণকে আহ্বান

জাতির সমস্ত শক্তি ও সম্পদের ব্যবহার এবং সকলের পূর্ণ সহযোগিতাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলিয়া মন্তব্য

নয়াদিল্লী ১৫ই আগস্ট—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বাধীনতা লাভের দ্বাদস বার্ষিক দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত এক বাণীতে বলেন, "একের পর এক বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। নূতন বৎসর আসিলেই পিছনের বৎসরগুলির দিকে তাকাইতে ইচ্ছা হয়। সেজন্য স্বাধীনতা দিবসে—যাহা গত বৎসরের শেষ এবং আগামী বৎসরের আরম্ভ সূচনা করে—আমাদের পক্ষে কিছুটা অন্তদর্শন করা খুবই স্বাভাবিক। যাহা করা হইয়াছে এবং যাহা করিতে বাকী আছে, এই দুইটিই জানিবার জন্য উহা প্রয়োজন।"

"আমি আপনাদের সুখ ও সৌভাগ্য কামনা করি। আমি শুধু এইকথা বলিতে চাই যে, আপনাদের প্রত্যেকে আপনাদের দৈনন্দিন কাজে ও চিন্তায় দেশকে স্বার্থের উর্দ্ধে রাখিবেন। শুধুমাত্র এই পথেই একটি জাতি সমৃদ্ধি ও তাহার প্রচেষ্টায় সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে পারে।" জয়হিন্দ্ !!

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

জাতীয় উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধ কঠোরশ্রমের আহ্বান

গ্রাম-ভারতের উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—অদ্য এখানে স্বাধীনতার দ্বাদশ বার্ষিকী উপলক্ষে লালকেল্লা হইতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐক্যবদ্ধ হইয়া কঠোর পরিশ্রম সহকারে সমবায়মূলক কাজের মধ্য দিয়া জাতিকে অগ্রগতির পথে লইয়া যাওয়ার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। তিনি ভাষাভেদ, প্রাদেশিকতা ও জাতিভেদের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, 'লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া আমাদের একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে।'

পি, টি, আই

১৫ই আগস্ট

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। দ্বাদশ বৎসর পূর্বে এই দিন এদেশে বৈদেশিক প্রভুত্বে উৎখাত সাধিত হয়। ভারতের এই স্বাধীনতা লাভ জগতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ব্যাপার। প্রবলতম সাম্রাজ্যবাদের সর্বতোময় প্রভুত্বে নাগপাশ ছিন্ন করিয়া মহৎ জাতির মুক্তিলাভের এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে মিলে না। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার বৈশিষ্ট্য শুধু ইহাই নয়। স্যম্রাজ্যবাদিগণের দ্বারা দীর্ঘদিন নির্যাতিত এবং নিপীড়িত বিশ্বের, বিশেষভাবে সমগ্র এশিয়ার মানব মণ্ডলীর বিপুল বেদনা ভারতের মর্মমূলে অবরুদ্ধ চেতনায় যেন পুঞ্জীভূত ছিল, ভারতের মুক্তিলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহা বীর্যবলে উদ্দীপিত আকাশে বাতাসে মানবমুক্তির উল্লাসে বিলসিত হইবার উপযোগী ছন্দসম্বন্ধ লাভ করে। নব স্বাধীনতা লব্ধ ভারতের অরুণোদয়ে মানবাত্মার অভিনব অভ্যুত্থান ঘোষিত হয়। স্বর্গ মুক্তিপ্রদায়িণী দেবীর জাগরণে দেবগণের জয়ধ্বনি যেন প্রাচীভূমির দিকে দিকে বাজিয়া উঠে। সেই ধ্বনি প্রভুত্বপর শোষক শক্তি সমূহের চিত্তে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। তাহাদের সাম্রাজ্যবাদের সৌধচূড়া প্রকম্পিত হয় এবং তাহাদের পতনের দিন দেখা দেয়। এশিয়ায় ভারতেই ছিল সাম্রাজ্যবাদের মূলঘাঁটি।

স্বাধীনতার যিনি দেবী, চিরদিনই তিনি দুরারাধ্যা। তাঁহার পথ কুসুমে চর্চিত থাকে না, সে পথ রুধির ধারায় চর্চিত। সে দেবীর

বেদীমূলে যাইতে হইলে রক্ত-গঙ্গায় পাড়ি ভিড়াইতে হয়। সন্তানের হৃদয়ের রক্তপদ্মের অর্ঘ্যোপচারে হয় তাহার পূজা। প্রত্যেক দেশ এবং প্রতি জাতিতেই দেবী সেই খেলা খেলিয়াছেন এবং তেমন পূজা পাইয়াছেন। এ দেশের মুক্তিকামী সন্তানগণ মাতৃ-বেদীমূলে বসিয়া মায়ের অত্যুগ্র-ভীষণ সেই মধুর মূর্তিরই অনুধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও দেখিয়াছিলেন দেবীকে লোলজিহ্ব ভৈরবভামিনীরূপে। নৃমুণ্ড মালিনী নবরুধিরাশনা সেই জননীর অট্টাট্ট-হাসি এদেশের আকাশে বাতাসে আবর্ত্ত তুলিয়া তাহাদের কর্ণেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে প্রমত্ত করিয়াছিল। স্বাধীনতার অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীর প্রসন্নতা অর্জন করিবার জন্য এদেশেও হোমের হুতাশন জ্বলিয়াছে এবং সাধকদিগকে সেই যজ্ঞে জীবন আহুতি দিতে হইয়াছে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৈপ্লবিক বীর্য্যের প্রচণ্ডতা, তাহার পরিপ্লাবন শক্তির ব্যাপ্তিশীল দীপ্তি বা বিভূতির বিশ্বজনের শুদ্ধকর প্রকাশ বা বিলাসের সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। ফরাসী-বিপ্লবে দেবী ছিন্নমস্তার রুধিরাসবপানে প্রমত্ত উৎসব জগৎ দেখিয়াছে, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের বজ্রানলের চমক বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছে। যুগান্তব্যাপী দুরন্ত স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রাশিয়ার বৈপ্লবিক জাগরণের নরমুণ্ড লইয়া বন্দুকের খেলায় রুদ্রতা সকল বাঁধ ছাপাইয়া ছোটে এবং নির্ম্মতায় ফোটে। স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিক্ষোভ অনেকটা পরিচ্ছন্ন আকারে ঘটিয়াছে, এজন্য সে সংগ্রামের অতিরুদ্র রূপটি—সকলের দৃষ্টিতে পড়ে না, কিন্তু দেবীর রুদ্রলীলা এখানেও খুলিয়াছে। অতীতের দিকে তাকাইলে তাঁহার নয়নের দীপ্তানলার্কদ্যুতি আমাদের দৃষ্টিকে সন্তপ্ত করে। সে অগুনের দাহও অপরিমেয়, আমাদের বুক পুড়িয়া যায়।

সিপাহীযুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সূচনা। বীর সন্তানেরা জননীর ললাটে রক্ত-তিলক পরাইতে সেদিন উদ্যত হন। ইহার পর একশত বৎসর ধরিয়া ভারতে নানা আকারে মুক্তিলাভের জন্য চেষ্টা চলিয়াছে। সেই সাধনায় অগণিত সন্তান আত্মাহুতি

দিয়েছেন। অম্লান বদনে তাঁহারা ফাঁসীকাঠে বন্ধনরজ্জু বরণ করিয়া লইয়াছেন। দুস্তর দুর্গম কান্তারে, প্রান্তরে, দেশান্তরে, দ্বীপান্তরে শত শত বীর প্রাণ দিয়াছেন। ইঁহাদের উত্তপ্ত রক্তে ধরণীতল সিক্ত হইয়াছে। বৃথা যায় নাই সেই আত্মদান, মুক্তিকামী বীরের রক্ত ব্যর্থ হইবার নয়। সেই রক্তের বিন্দু বিন্দু সম্পাতে এ দেশের মর্মমূলে শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছে এবং বহ্নিবীর্যে সেই শক্তির সমুদ্গমে ভারতের স্বাধীনতা মিলিয়াছে। বস্তুত আমাদের স্বাধীনতা লাভের পথের ধারা বিচার করিতে গিয়া সিদ্ধির সন্ধিস্থলে শুধু স্থূলের বিচারটি করিলে চলিবে না। প্রত্যুত স্থূল রূপটি প্রমূর্ত এবং পরিস্ফূর্ত করিয়াছিল। মূলে যাহাদের অবদান, আমরা তাঁহা-দিগকে বিস্মৃত হইতে পারি না।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের হাতে শাণিত যে অসি ঝলক খেলিতেছে, কাহার দৃষ্টি বিপুল বিস্ময়ে সে দিকে না পড়িবে, কে আছে এই ভূ-ভারতে যে তাঁহার জয় না দিবে? প্রকৃত প্রস্তাবে বৈদেশিক শাসনকে উৎখাত করিবার জন্য সাগ্নিকরূপে যাঁহারা পুরোগামী হইয়াছেন, পথের বিচার তাঁহারা করেন নাই, কিংবা করিতে পারেন নাই। আদর্শ সিদ্ধিই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। একান্ত আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠ তাঁহারা, তাঁহারা বীর। তাঁহারা আমাদের বন্দনীয়। তাঁহাদের আদর্শ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করিয়াও একথা বলা চলে যে, মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত অহিংস পদ্ধতি ভারতের স্বাধীনতা লাভের অন্যতম কারণ। গান্ধীজীর ন্যায় বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষের নেতৃত্ব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টিতে অসামান্য বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ইতিপূর্বে গান্ধীজীর ন্যায় মহা-মানবের নেতৃত্বে জগতের কোন দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত হয় নাই। হিংসার বদলে হিংসা মানব মুক্তির সংগ্রামও এই ধারা চলিয়াছে। গান্ধীজী সর্বত্র নানা রাজনীতিক ক্ষেত্রে অহিংসাকে অস্ত্রস্বরূপে অবলম্বন করেন। তাঁহার নেতৃত্বে এ দেশে বিপুলভাবে জনগণের জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ স্বাধীনতা-সংগ্রামে অপ্রতিহত

শক্তি দেয় এবং ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। পারস্পরিক জিঘাংসার প্রকৃতিই পাশ্চাত্যের সভ্যতাগর্বী জাতি সমূহের নিকট এতকাল মর্যাদা লাভ করিত। তাহারা সেই মর্যাদাবলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল জাতি সমূহকে মানুষ করিবার ঔদ্ধত্য অন্তরে পোষণ করিত। অহিংস সংগ্রামের পথে ভারতের স্বাধীনতা লাভে তাহাদের মোহ ভাঙ্গিতে তাহাদের বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে এবং জনশক্তির সংহত প্রয়োগে মানবোচিত অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে জগতের পরাধীন দুর্গত জাতিগুলি এই সংগ্রামে নূতন পথ পাইয়াছে। ভারতের মুক্তি এই হিসাবে বিশ্বমানবের মুক্তি এবং মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক অভিনব অধ্যায় জগতে উন্মুক্ত করিয়াছে।

স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি, কিন্তু পাওয়াটাই বড় কথা নয়, স্বাধীনতার মর্যাদা রাখিতে হইবে। অতীত এবং ভবিষ্যতের বর্তমান সন্ধিক্ষণে আমাদের উপর গুরুতর দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। ভারত আজ কোন পথে চলিবে, সেই দিকে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট রহিয়াছে, তাঁহারা অন্তরের সঙ্গে লক্ষ্য করিতেছেন বহুযুগের সংস্কৃতি-সমৃদ্ধ বিরাট এই জাতির অভ্যুন্নতির গতি ও প্রকৃতির গতি। স্বাধীনতার প্রতিবেশে জাগ্রত জাতির মর্যাদা ও দায়িত্ববোধে আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। স্বাধীনতা বীরভোগ্যা। মানুষ যাহারা, দুর্লভ সে বস্তু ভোগে শুধু তাহাদেরই অধিকার—পশুর ভোগ্য নয় স্বাধীনতা। স্বাধীনতা দিবস এই সত্য সম্বন্ধে আমাদিগকে জাগ্রত করুক—ইহাই প্রার্থনা।

দৈনিক বসুমতী

১৫ই আগস্ট

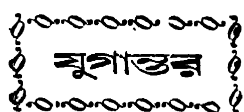
প্রত্যেক জাতির জীবনেই স্বাধীনতা দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য্য বহন করিয়া আনে। ১৫ই আগস্ট ভারতবাসীর জীবনে সর্ব্বাপেক্ষা

স্মরণীয় দিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে পরাধীনতার জ্বালায় জর্জরিত হইয়া দেশের অগণিত যুবক-যুবতী সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য জীবন আহুতি দিয়াছিল—এই পুণ্য দিবস সেই পরাধীনতার কলঙ্ক কালিমা ভারতবর্ষের বুক হইতে চিরতরে মুছিয়া দিয়াছে। এইদিন তাই উৎসব ও আনন্দের দিন। তবুও অস্বীকার করিবার উপায় নেই যে, এইদিন অনেক ব্যথা ও বেদনার স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া আসে। যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেশের লোক শতাব্দীকাল ধরিয়া দেখিয়াছিল, সেই স্বাধীন ভারত আমরা পাই নাই। বিশ্বাসঘাতকা, সুবিধাবাদ ও সঙ্কীর্ণ দলগত স্বার্থের ধূপকাষ্ঠে আমরা অখণ্ড ভারতকে বলি দিয়াছি; দেশের মানুষের বহু পুরুষের সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত জন্মভূমিকে কৃত্রিম বিভাগের সীমারেখা টানিয়া বিদেশ করিয়া দিয়াছি; লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুকে কপর্দকহীন, বাস্তুহীন, সম্ভ্রম ও মর্যাদাহীন ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছি। এই বেদনা, ব্যর্থতা ও পরাজয়ের আত্মগ্লানি আজ উৎসবের অনান্দকে কিছুটা ম্লান করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

গান্ধীজী ভারত বিভাগের প্রয়াসকে একদিন মহাপাপ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজও আমাদের পূর্ণ হয় নাই। ভারতে আজ যত সমস্যা রহিয়াছে তাহার অনেক কিছুর মূলেই রহিয়াছে ভারত বিভাগের প্রতিক্রিয়া। কিন্তু সেই সমস্যা ছাড়াও নূতন নূতন সমস্যা প্রতিদিন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। দেশের অন্ন সমস্যা ও বেকার সমস্যা চরমে উঠিয়াছে। স্বাধীনতার ফলে দেশের লোকের অনাহার ও অদ্ধাহার ঘুচিবে বলিয়া যাঁহারা আশা করিয়াছিলেন তাহাদের সম্পূর্ণ নিরাশ হইতে হইয়াছে। লোকের পেটে অন্ন নাই, মাথা গুঁজিবার উপযুক্ত ঠাঁই নাই, ভবিষ্যৎও নিদারুণ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে আবৃত। এই শোচনীয় বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করিতেছে হতাশা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই বাসা বাঁধিয়াছে দুর্নীতি অসামাজিক পঙ্কিলতা। পুরাতন নীতিবোধ দারিদ্র্যের আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া

যাইতেছে নূতন নীতিবোধ আজও দানা বাঁধিয়া উঠে নাই।

সমস্ত দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র-নিপীড়ণ, অভাব-অনটন সত্বেও যদি ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা সাধারণ মানুষ দেখিতে পাইত তবে অবস্থা এমন শোচনীয় হইত না—সদ্য স্বাধীন জাতির মনে পরাজিতের মনোভাব এমন করিয়া শিকড় গড়িয়া বসিত না। কিন্তু মানুষ যখন চোখের সম্মুখে নিজ স্ত্রী পুত্রকে অনাহার ও অদ্ধাহারে দিন কাটিইতে দেখে, যখন স্ত্রী কন্যার সম্মান ও মর্যাদার বিনিময়ে জীবন যাপনের গ্লানি তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারে এবং যখন অন্য এক শ্রেণীর হাতে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের পাহাড় জমিয়া উঠিতে দেখে তখন তাহার মনুষ্যত্ব আর থাকে না। ভারতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র আজ তাই শুধু নিদারুণ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়াছে। ১৫ই আগস্ট তাই শুধু উৎসবের দিন নয়—আত্মজিজ্ঞাসার ও আত্মবিশ্লেষণের দিন। যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পাইয়াছি তাহাকে দেশের নিরন্ন শতকরা ৯০ জন নরনারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় যদি রূপান্তরিত করিতে না পারি, তবে এই স্বাধীনতা একটি মারাত্মক উপহাসে পরিণত হইবে; আজিকার গণতন্ত্র আপন ব্যর্থতার পঙ্ককুণ্ডেই একদিন আত্মবিসর্জন দিতে বাধ্য হইবে।



স্বাধীনতা দিবস

আজ পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সারা ভারতবর্ষ আজ উৎসবনিরত। দীর্ঘ রাজনৈতিক পরাধীনতা অন্তে যেদিন দেশের শাসনভার দেশের দায়িত্বশীল নেতাদের হাতে আসিয়াছে,

সেদিন জাতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় আনন্দদিনরূপে পরিগণিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। দুই শতাব্দী ধরিয়া ভারতের ধ্যানী, জ্ঞানী, কবি ও শিল্পীরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন, নায়ক ও সংগ্রামীরা যাহার জন্য অকাতরে দুঃখ ও বেদনা বরণ করিয়াছেন, দুঃসাহসী তরুণরা জীবন দিতে কার্পণ্য করেন নাই, তাহা জাতির করতালগত হওয়ার মতো আনন্দ আর কি আছে? স্বাভাবিক কারণেই ছোট-বড় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ আজ উৎসবে মাতিবেন। জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করিয়া সকলেই আজ সুখী সমৃদ্ধ ও সমুন্নত মানুষের বাসভূমিতে পরিণত করার সঙ্কল্প ব্যক্ত করিবেন। ভারতবর্ষ যাহাতে তার দৈন্য, বেদনা ও অনগ্রসরতা ঝাড়িয়া ফেলিতে এবং বিশ্বের সমুন্নত ও অগ্রগামী দেশগুলির সহযাত্রীরূপে সার্বজাগতিক কল্যাণের পথে পা বাড়াইতে পারে, আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম, সমস্ত মনন ও চিন্তনকে সেইভাবে গড়িয়া তোলার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োগের ব্রত গ্রহণ করিবেন। এ কথা অনস্বীকার্য যে, স্বাধীনতা নিজস্বভাবেই এক অমূল্য সম্পদ। কিন্তু স্বাধীনতার মহত্তর মূল্য যে মানুষের মুক্তি ও কল্যাণে, এ বিষয়েও সন্দেহ নাই। রাজনৈতিক পরাধীনতার অবসানে সেই প্রত্যাশিত মুক্তির পথ আমাদের সামনে উন্মুক্ত হইয়াছে। এই পথে পৌরুষ ও প্রজ্ঞার সঞ্চয় হাতে নিয়া জাতিকে আগাইতে হইবে। সমস্ত দ্বিধা, বাধা ও প্রতিকূলতাকে মনুষ্যত্বের প্রভাবে জয় করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতকে তবেই আমরা সমৃদ্ধ ভারতে রূপায়িত করিতে পারিব। তবেই আমাদের বরণীয় পূর্বাচর্যদের যাদের স্বপ্ন ও সাধনা, বেদনা ও দুঃখবরণ প্রকৃত স্বার্থকতামণ্ডিত হইবে।

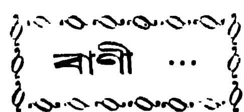
আজ স্বাধীনতা দিবসের এই পুণ্য লগ্নে যেমন আমরা উৎসব করিব, তেমনি যাহাতে আমাদের চতুষ্পার্শ্বের বাস্তব আবেষ্টনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, সেদিকেও সতর্ক থাকিতে হইবে। দুইশত বর্ষ ব্যাপী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যখন আমরা জীবনমরণ সংগ্রামে ব্যাপৃত, পৃথিবীর অগ্রগামী দেশগুলি তখন বিজ্ঞানের

পাখায় ভর করিয়া বৈষয়িক উন্নতির সমুচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছে। ভারতবর্ষ এই বিজ্ঞান প্রগতির আশীর্বাদ কমই পাইয়াছে। বিদেশী-বণিক শাসকরা এখান হইতে শুলভ মূল্যে কাঁচামাল সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আপন দেশের কারখানায় বানানো পণ্য আনিয়া আবার এখানকার বাজারে বেচিয়া কোটি কোটি টাকা কামাইয়াছেন। এই লেনদেনের জন্য যতটুকু, ততটুকু আধুনিকতা বিধানই তাঁহারা করিয়াছেন এদেশের এবং তাহার ফলেই বেশীর ভাগ ভারতবর্ষ এই বিংশ শতাব্দীতেও মধ্যযুগীয় সামাজিক অবস্থা আঁকড়াইয়া থাকিয়াছে। সেই পটভূমি প্রায় অপরিবর্তিত রাখিয়াই বৃটিশ শাসন শেষ হইয়াছে। কাজেই নিরন্নতা, নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্য ও অনগ্রসর সমাজ-ব্যবস্থার পঙ্ক ঝাড়িয়া ফেলিয়া মানুষ উজ্জ্বল গৌরবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানোর যোগ্যতা আজিও লাভ করে নাই। স্বাধীনতার মূল্য হিসাবে যে ভারত বিভাগের দুর্ভাগ্য আমাদের মানিয়া নিতে হইয়াছে, তাহার পরিপূরক রূপে বরং আসিয়াছে গৃহহীন, আশ্রয়হীন লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর সমস্যা। এই সমস্ত নিরন্ন নিরাশ্বাস মানুষ আজিও স্বাধীনতার সজীব আলো-হাওয়ার স্পর্শ অল্পই পাইয়াছেন। অথচ এই অগণ্য বঞ্চিত বিড়ম্বনাহত নীচের ধাপের মানুষের উন্নয়নেই হইল স্বাধীনতার আসল শক্তি। ইঁহারাই জাতির কর্মী, সৈনিক, সেবক ও শ্রমকারী। ইহাঁদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা আশ্রয় করিয়াই জাতিকে গড়িয়া উঠিতে হইবে। আজিকার স্বাধীনতা উৎসবের প্রধান অঙ্গই হউক আমাদের এই সমস্ত মানুষকে পূর্ণ মানুষের অধিকারে বাঁচিয়া থাকার মতো সমাজ সংগঠনের সঙ্কল্প। কারণ মানুষই দেশ এবং মানুষের শ্রীবৃদ্ধিতেই দেশের সমৃদ্ধি ও শ্রী।

এ কথা বলাই অনাবশ্যক যে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও মানুষের সমুন্নতির জন্য আমাদের কর্ম প্রচেষ্টা নানামুখে প্রবাহিত হইতেছে। বিবিধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা দেশকে যুগের আলোকে জীয়াইয়া তোলার চেষ্টা করিতেছি। উৎপাদন ও গতির ক্ষেত্রে বেগ সঞ্চার করিয়া আমরা আমাদের সুবিদিত মন্থরতার

অবসান ঘটাইতে অগ্রসর হইয়াছি। কৃষি শিল্প, শিক্ষা স্বাস্থ্য, সকল বিভাগেই আমাদের মন ও হাতের সক্রিয় সহায়তা সংযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের চাহিদা যতখানি, প্রয়োজন যত বড়, তাহার অনু-পাতে এই কর্মোদ্যম হয়ত পর্যাপ্ত নয়। হয়ত এই বেগে চলিলে, আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌছিতে বহু বিলম্ব হইবে এবং তাহাতে অনেক সম্ভাবণীয়তা অনেক সম্পদের অপচয় হইবে। কাজেই আগে সর্বা-ঙ্গীন উন্নয়ন ও তাহার পর সমাজের রূপান্তর না রূপান্তরিত নূতন সমাজের বুনিয়াদের উপর উন্নয়ন কর্ম, কোনটি বেশী অভিপ্রেত, কোনটি আমাদের পক্ষে অধিক লাভজনক হইবে, সে প্রশ্ন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু তর্কের কথা যাই হউক, দুইশত বর্ষের ভাগ্যবিড়ম্বনায় যা হইয়াছে, মাত্র বারো বছরে তাহার আমূল পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ধৈর্য, তিতিক্ষা ও শ্রম চাই। শুধু তাহারি জোরে আমরা বর্তমানের সমস্ত দুঃখ-বেদনা জয় করিতে এবং নূতন দিনের সুখস্বপ্নগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারিব। হতাশা ও দৈন্য মৃত্যুর দোসর। ভারতের মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ কোনদিন সেই পরাভবকে স্বীকার করিবে না, স্বাধীনতা দিবসের এই পবিত্র তিথিতে আজ ইহাই হউক আমাদের সকলের সঙ্কল্প। শান্তি, প্রেম, ঐক্য ও মনুষ্যত্বের প্রতীকরূপে অশোক-চক্র চিহ্নিত আমাদের ত্রিবর্ণ জাতীয় পতাকা চিরদিন উদার আকাশে উন্মুক্ত থাকুক। জাতি যুগ যুগ ধরিয়া এই পতাকার গৌরব মানুষের মতো বহন করুক। মহাভারতের পূর্ণ তীর্থে সার্বভৌম প্রেম ও মণীষার মিলন ক্ষেত্র রচিত হউক।

—জয় হিন্দ!



শ্রমিকেরা নিজেদের শক্তি ও মর্যাদা সম্বন্ধে সজাগ হউক। শ্রমিকের তুলনায় বণিকের না আছে মর্যাদা না আছে শক্তি, খুব সাধারণ লোকেরও কিন্তু এসব আছে। মহাত্মা গান্ধী

আসামে বাঙালী হত্যা

বাঙালীর শোক ও যন্ত্রণা

১৯৬০

আসামে অগণিত বাঙালী মা, ভাই, বোন, আত্মীয় পরিজনদের প্রাচীনকালের অসভ্য রীতিনীতির কায়দায় হত্যা করা, ধর্ষণ করা, লুঠ করা, প্রহার করা হচ্ছে। সেখানকার বাঙালীদের একমাত্র অপরাধ তাঁরা বাঙলায় কথা বলে, বাঙালী সভ্যতা মেনে চলে।

- রাষ্ট্রপতির বেতার ভাষণ
- প্রধান মন্ত্রীর ভাষণ
- আনন্দ বাজার পত্রিকা
- দৈনিক জনসেবক
- দৈনিক বসুমতী
- যুগান্তর
- লোকসেবক
- স্বাধীনতা

- বাণী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু
  রাজা রামমোহন রায়

আসামীদের ধ্বনি

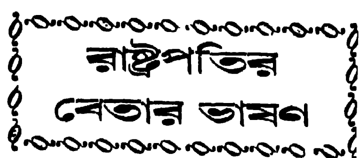
বাঙালী আসাম ছাড়ো,
বাঙালী বাঙলা বুলি ছাড়ো,
বাঙালী দুশমন।

বাঙালীদের ধ্বনি

বাঙলা বুলি আমার মায়ের বুলি। এই বুলি (ভাষা) রক্ষা করার জন্য সমগ্র ভারত একত্রে হলেও ত্যাগ করতে পারব না। আসাম তোমরা মনে রেখো, ভারতের প্রাণ, ভারতের সম্মান, ভারতের সম্পদ বাঙালী। বাঙালী বাঁচলে ভারত বাঁচবে।

ভারতের সংহতি বজায় রাখতে হলে ভাষাগত প্রশ্নের উস্কানিতে এক অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের পূর্ণ মর্যাদা দেবে ইহাই কাম্য। সরকারের পরোক্ষ সমর্থনের ফলে বাঙালীরা অন্য অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হবে—এটা আশা করা আর সংহতিকে আগুনে নিক্ষেপ করা একই কথা।

দেশ স্বাধীন—ভাষার প্রশ্নে সকলের সমান অধিকার থাকা চাই



সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা বর্জ্জন করিয়া ভারতের ঐক্য দৃঢ় করার আহ্বান

নয়াদিল্লী, ১৪ই আগস্ট—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আজ দেশবাসীগণের উদ্দেশে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তাঁহার বাণীতে বলেন, "আমাদের স্বাধীনতা লাভের ত্রয়োদশ বার্ষিকী উপলক্ষে আমার দেশবাসীগণকে এবং বিদেশস্থ ভারতীয়গণকে অভিনন্দন জানাইবার সুযোগলাভ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

"মাঝে মাঝে বিক্ষোভাত্মক ঘটনাবলী আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, আমাদের ঐক্যের চিত্রের মধ্যে গলদ আছে, ...। জনগণকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিতে হইবে।"

"আমি আমার দেশবাসীকে এইসব বিষয় চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি, জাতীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া, ঐক্য ও সংহতিকে সুদৃঢ় করিয়া আমরা অগ্রগতি অব্যাহত রাখিব, ইহাই আমাদের ব্রত হউক। —জয় হিন্দ্"

প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ হইতে ভারতের স্বার্থ অনেক বড়

স্বাধীনতা উৎসব বর্জনে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশ

নয়াদিল্লী, ১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতার বার্ষিকী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু লালকেল্লার দুর্গপ্রাকার হইতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদানকালে দৃঢ়স্বরে বলেন যে, 'কোন কোন বিষয়ে "তিক্ততার" ফলে পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য স্থানে স্বাধীনতা দিবস পালন না করার জন্য যাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ অথবা ভারত কাহারও স্বার্থরক্ষা করিতেছেন না। তাঁহারা স্মরণ রাখুন যে, ভারত আসাম অথবা পশ্চিমবঙ্গ হইতে অনেক বড়।'

আসামের সাম্প্রতিক হাঙ্গামার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীনেহরু বলেন, 'আসাম ও বাংলা দুইটি বৃহৎ প্রদেশ। এখানে তিক্ততা ও নিপীড়ন থাকিতে পারে, তাহা দূর করিতে হইবে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, তিক্ততার পিছনে বুলি রহিয়াছে। এবং এই ভীতির জন্যই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইতেছে না।'

পি, টি, আই

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বাঙালীর বেদনা

১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস। ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্বে এই দিন বিদেশী সৈন্য এদেশের বেলাভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করে এবং ভারত দীর্ঘদিন পরে স্বাধীনতা পায়। স্বাধীনতায় মানুষের চিরন্তন অধিকার। পরাধীনের জীবন ক্রীতদাসের জীবন। পশুত্বের নিগুড় বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এই দিনে আমরা মানুষের মত মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার সুযোগ লাভ করি। সেদিন আমাদের মাথার উপর খোলা আকাশ, আমাদের চারিদিকে খোলা বাতাস—চিত্ত যেথা ভয়হীন, মুক্ত সেথা প্রাণ। ভারতের সর্বত্র মুক্তির এমন প্রতিবেশে আনন্দের গান বাজিয়া ওঠে, জাগে দিকে দিকে উৎসবের কলরব।

মানুষের মুক্তি, ইহার অপেক্ষা বড় আনন্দ আর কিছুতে নাই। বড় উৎসবেরই এই দিন। শুধু মানুষ কেন, পরকীয় প্রভুত্বের গ্লানি কাটাইয়া মানুষের এমন অভ্যুত্থানের দিনে দেবতারাও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। মানুষের উৎসবেও তাঁহাদেরও গৌরব।

তেরো বৎসর পর আজ এক নিদারুণ দুর্যোগের গাঢ়কৃষ্ণ অন্ধকারে বাংলা ও বাঙালীর জীবন সমাচ্ছন্ন, শোকের গভীর অনুভূতিতে হৃদয় অভিভূত। স্বাধীনতাকে ভালবাসে বলিয়াই আঘাতে অপমানে জর্জরিত বাঙালী আজ স্বাধীনতা দিবসে উৎসব অনুষ্ঠান বর্জন করিয়াছে।

আমরা বাঙালী এদিনে আমরা উৎসব করিব না। ভারতের মুক্তির জন্য বাঙালীর অবদান কেনা জানে? 'রক্তসিন্ধু মথিয়া আজ করিয়া মথন আনিব তুলিয়া স্বাধীনতা ধন'—বাঙালীই এই সঙ্কল্প প্রথমে গ্রহণ করে। বুকের রক্তে বাঙালী মুক্তির ব্রতে দীক্ষা লয়। বাঙালী তাহাদের হৃৎপদ্ম ছিঁড়িয়া মায়ের পায়ে অর্ঘ্য দেয়। তাহারা ঘরের মঙ্গলশঙ্খ ছাড়িয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সঙ্কট যাত্রায় বাহির হয়। দুর্গমের পথে বাঙালীর সেই অভিসারে মানব-মুক্তির ইতিহাসে লোক-স্মরকর অধ্যায় রচিত হইয়াছে।

তথাপি এ বৎসর বাঙালী স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জন করিয়াছে। বাঙালী কোন উৎসব এবার করিবে না। করিতে পারে না। দুঃসহ বেদনায় তাহাদের অন্তর দগ্ধ হইতেছে। সহস্র সহস্র বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিগৃহীত আমাদের দেশবাসী আমাদেরই ভ্রাতা, আমাদেরই জননী, আমাদেরই ভগিনীর অশ্রুসজল ব্যাকুল মুখ আজ আমাদের চোখে পড়িতেছে। আমরা ভুলিতে পারি কি সেই ব্যথা? এমন বেদনা বুকে লইয়া আনন্দ-উৎসবে মাতিব, এত বড় বঞ্চনা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। বাঙালী মানব-মুক্তির উপাসক। স্বাধীনতার মর্যাদা বাঙালী সর্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু বলিয়া মনে করে। সেই মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। এখনও সেই জন্য তাহারা সর্বস্ব বিসর্জন করিতে প্রস্তুত। বস্তুত, ভারতের স্বাধীনতার প্রতি আন্তরিক এই মর্যাদা বুদ্ধিই বাঙালীকে বর্তমান বৎসরের উৎসব পরিবর্জন করিতে বাধ্য করিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসের উৎসবের নামে বাঙালী স্বাধীনতার প্রাণধর্মের উপর আঘাত করিতে পারে না।

বাঙালীর আর কি আছে? ভারতের মুক্তির জন্য তাহারা সবই ত দিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য চরম মূল্য দিয়াছে বাঙালী তাহার মাতৃভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া; লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে স্বীয় বাসভূমি ছাড়িয়া অভিশপ্ত আশ্রয়চ্যুত জীবনের বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা বরণ করিতে হইয়াছে। তেরো বৎসরের স্বাধীনতায় বাঙালী

হারাইয়াছে অনেক কিছুই। বাংলার শিক্ষা, বাংলার সংস্কৃতি আজ এলাইয়া পড়িয়াছে; বাঙালীর সমাজ জীবন এবং অর্থনৈতিক সংস্থান বিধ্বস্ত হইয়াছে। হাজার হাজার বাঙালী-পরিবার আজ অন্নহীন, বস্ত্রহীন, নিরাশ্রয় পথের বাহির—আজ তাহারা ভিখারী। এত দুঃখে, এত কষ্টে কোন জাতি বাঁচে না, বাঁচা সম্ভবও নয়। তবুও বাঙালী মরে নাই। দুরন্ত দুঃখের ব্যথা বুকে লইয়া তাহারা বাঁচিয়া আছে।

আসামের সাম্প্রতিক ব্যাপার বাঙালীর ভারতীয় রাষ্ট্র সাধনায় বাঙালীর বিশিষ্ট বলিষ্ঠ সর্বজনীন আদর্শের ভিত্তিভূমি পর্যন্ত ভাঙিয়া দিয়াছে। অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয়তা বোধই ভারতের স্বাধীনতার প্রাণবস্তু। ভারতের সকল অংশের, সকল প্রদেশের অধিবাসীদেরই সমান অধিকার; অন্যথায় ভারতের স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না। এদেশের সংবিধানে ভারতীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের মূলসূত্রস্বরূপে ইহা স্বীকৃত।

আসামে বাঙালী-নির্যাতন স্বাধীনতার এই মৌলিক অধিকারের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ। আসামের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সংবিধান-সম্পর্কিত তাহাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে যদি কিছুমাত্র সচেতন থাকিতেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাহায্য যদি পিছনে না থাকিত, তবে বাঙালী-উৎসাদনের দুরন্ত তাণ্ডব এবং আসামের নানা স্থানে দিনের পর দিন ক্রমাগত অত্যাচার, নির্যাতন, কিছুতেই সম্ভব হইত না। প্রতীকারের আশায় বাঙালী কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দিকে তাকাইল। তাহারা আশা করিয়াছিল কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কিছুতেই সাক্ষাৎ-সম্পর্কে সংবিধান ব্যবস্থার এই লঙ্ঘন স্বীকার করিয়া লইবেন না। আসামের প্রশাসনের ভার নিশ্চয়ই রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সে দিক হইতে সহানুভূতির কোন সাড়াই আসিল না। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আসামে বাঙালী নির্যাতনের ব্যাপারে গুরুত্বের লাঘব করিতে সকল দিক দিয়া সচেষ্ট হইলেন। তাহারা বলিলেন, প্রশাসনিক ভার রাষ্ট্রপতির হস্তে গ্রহণ করিবার মত অবস্থা আসামে সৃষ্টি হয় নাই। তাঁহাদের মতে যে সব ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সেগুলি অধিকাংশই অতি-

রঞ্জিত, কেন্দ্রীয় সংসদে আমাদের ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করিবার সুযোগও তাঁহারা দিলেন না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কর্মপরিষদ ও শাসন কর্তৃপক্ষও সেই সুরেই সুর মিলাইয়া লইলেন।

বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের পরিচালক মণ্ডলী দলগত স্বার্থকেই বড় করিয়া দেখিতেছেন। আসামের ব্যাপারে গুরুত্ব লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের সকল চেষ্টার মূলে সেই দৃষ্টিই রহিয়াছে। বস্তুত, সংবিধানের মূল্য তাঁহাদের কাছে এই দিক হইতে তুচ্ছ গণ্য হইয়াছে। আসামের ব্যাপারকে লাঘব করিবার জন্য তাঁহাদের এই অসঙ্গত প্রচেষ্টা বাঙালীর বেদনা দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে, স্বাধীন ভারতের অধিবাসী স্বরূপে মৌলিক অধিকারের কোন মূল্যই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নাই। সে দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি থাকিলে তাঁহারা আসামের ব্যাপারের গুরুত্ব উপেক্ষা করিতে পারিতেন না।

বস্তুত, গুরুত্বের বিচার কোন দিক হইতে করিব? আসামে সহস্র সহস্র বাঙালী পরিবার আজ পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছে। নারীর অশ্রুতে মৃত্তিকা সিক্ত হইতেছে। এসব ঘটনার অন্তর্নিহিত ক্রূরতা ও বর্বরতার কথা মনে হইলে ব্যাপকতার বিচার উঠে কি? অনন্ত মানুষের মনে উঠিবার কথা নয়। এসব দৌরাত্ম্য সমাজদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, এই সব অত্যাচার, এগুলিকে গুরুত্ব না দিলে শাসনকর্তৃপক্ষ যাঁহারা, দেশের কাছে, জাতির কাছে এবং নিজেদের বিবেকের কাছে তাঁহাদের অমার্জনীয় অপরাধ ঘটে। জগতের কোন সভ্য এবং সুগঠিত রাষ্ট্রের এমন সব অপরাধ লঘু বলিয়া বিবেচিত হয় না। বস্তুত, আসামে যদি একজন বাঙালীর উপরও অত্যাচার হইয়া থাকে, যদি একটি নারীর উপরও নির্যাতন সেখানে হয়, তবে স্বাধীন জীবনের মৌলিক অধিকারের দিক হইতে তাহাই গুরুতর। কেরলের ব্যাপার আসামের ন্যায় সর্বভারতীয় গুরুত্ব লাভ করে নাই। অন্য ভাষাভাষী বলিয়া সেখানে কাহারও উপর অত্যাচার হয় নাই। সে দিক হইতে গৃহদাহ, নরহত্যা, নারীনিগ্রহ সেখানে ঘটে নাই।

তবু সেখানকার প্রশাসনিক অধিকার রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের ব্যাপারকে উপেক্ষা করিতে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি সংবিধানের দিক হইতে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং কোনক্রমেই বিচার সহ নয়। স্বাধীন ভারতের ভবিষ্যতের দিক হইতেও তাঁহাদের এই দৃষ্টি, এমন বিচার মারাত্মক এবং চূড়ান্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

ফলত, এইভাবে আসামের ব্যাপারের গুরুত্বকে লঘু করিলেই সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে; উৎসাদিত পরিবার সমূহের পুনর্বসতির ব্যবস্থা কোনক্রমে ধরিয়া দিলেই সেখানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে, তাঁহারা কিছু স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিলেই সকল গোলযোগ কাটিয়া যাইবে, কতৃপক্ষের ইহাই বিশ্বাস। এসব তত্বকথায় কোন সান্তনাই আমরা পাই না। প্রকৃত প্রস্তাবে অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রমর্যাদা প্রশাসন নীতিতে অলঙ্ঘনীয় করিয়া তোলাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে উপেক্ষা সুস্পস্ট। তাঁহারা যে কোনভাবে আসামের ব্যাপারকে চাপা দিতে চান। স্বার্থভীরু তাঁহারা, আমরা এই কথাই বলিব। তাঁহাদের এই নির্লজ্জতা, বিবেকবিহীন তাহাদের এই মূঢ়তা বাঙালীকে নিতান্ত ব্যথিত এবং মর্মাহত করিয়াছে। স্বাধীনতা দিবসের উৎসব বর্জন করিতে বাঙালী তাই বাধ্য হইয়াছে। স্বাধীনতার প্রতি মর্যাদাবোধই এই সঙ্কল্প গ্রহণে তাহাদিগকে প্রণোদিত করিয়াছে। স্বাধীন ভারতে তাহারা মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা দেখিতে চায়। বন্য বর্বরের দৌরাত্ম হইতে তাহারা নিজেদের দেশের চিরন্তন মূর্ত্তি কামনা করে কাহারও প্রতি উত্তেজনা বা বিদ্বেষবুদ্ধি এই ব্যবস্থা গ্রহণের মূলে নাই সে পথে সমস্যার প্রতিকার সাধিত হইবে না, ইহা উপলব্ধি করিবার মত বুদ্ধি এবং তদুপযোগী সংস্কৃতি বাঙালীর আছে।

বাঙালী ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে সুদৃঢ় রাখিতে তাহাদের সমগ্র মনোবল লইয়া দুরন্ত বেদনায় জাগ্রত হইয়াছে। ভারতের মুক্তির অগ্নিমন্ত্রে বাঙালী দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছে। প্রাদেশিক এবং দলীয় স্বার্থের বিচারকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরিয়া তাহারা ব্রত ভঙ্গ করিবে

না। অধিকন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীকে স্বাধীন ভারতের মৌলিক অধিকারের আদর্শে নিষ্ঠিত রাখিবার জন্য বাঙালী তাহাদের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিবে। তাহারা অন্তরের সকল বেদনা দিয়া অখণ্ড ভারতের রাষ্ট্রীয় চেতনা উদ্দীপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা এদেশে মানুষ গড়িয়া তুলিবে। মনুষ্যত্বের বিরোধী মনোভাবের সে বলিষ্ঠ বীর্যে বিরুদ্ধতা করিবে, ব্যর্থ করিবে তেমন অপচেষ্টাকে যে দিক হইতেই তাহা আসুক। ভারতের স্বাধীনতার মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বেরই মর্যাদা, সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতে গিয়া বাঙালী মরিতে হয় মরিবে এবং বাঁচিতে হয় স্বাধীন মানুষের পরিপূর্ণ মহিমা লইয়াই তাহারা বাঁচিবে। চতুর্দ্দশ বার্ষিক স্বাধীনতা উৎসবে বাঙালী হৃদয়ের রক্ত দিয়া এই সঙ্কল্প গ্রহণ করিতেছে। বাঙালীর এই বেদনা সংহত হোক, সংযত হোক এবং সার্থকতা লাভ করুক এই প্রার্থনা।

দৈনিক জনসেবক

পনরই আগস্ট

আজ পনরই আগস্ট—নবভারতের, শুভজন্মদিবস। ১৯৪৭ সালের এই দিনটিতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ শতাব্দীর তিমিরাবগুণ্ঠন ভেদ করিয়া অভিনব ভারত বাহির হইয়া আসে তাহার জ্যোতির্ময় দিব্য মূর্ত্তিতে। শাশ্বত ও সনাতন ভারত যেদিন সুনীল জলধি হইতে জাগিয়া উঠে কবির ভাষায় সেদিন ভারতের প্রভায় ধরার তিমিররাত্রি প্রভাত হইয়াছিল। নবভারত যেদিন শতাব্দীর তিমিরাবগুণ্ঠন বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল বিংশ-শতাব্দীর এই বিশ্বের বুকে সমগ্র

এসিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন জাতিসমূহের বন্ধন শৃঙ্খলে সেদিন ঝন্‌ঝনা শব্দে বাজিয়া উঠে মুক্তি বন্দনা-গান। সে গান শুনিয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গনিল, বুঝিল ইহা তাহারই বিসর্জনের বিদায় সঙ্গীত।

এসিয়া ও আফ্রিকার দ্রুত প্রবহমান ঘটনা-তরঙ্গ অচিরে প্রমাণ করিয়া দিল, সে আশঙ্কা অমূলক ছিল না। সামরিক ব্যাণ্ডে-ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বাজাইয়া বিদায়ী ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শেষ জাহাজ যেদিন ভারতের উপকূল ত্যাগ করে, সে সুরলহরী তরঙ্গ শীর্ষে শীর্ষে উছলিয়া উঠিয়া প্রহত হয় সপ্তসিন্ধুর কূলে কূলে। সে তরঙ্গের তালে লক্ষ-শীর্ষ বাসুকী-ফনা আন্দোলিত করিয়া ছন্দে ছন্দে নাচিয়া উঠে, সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা মাতিয়া উঠে মুক্তির মহোৎসবে। সে আন্দোলনের আঘাতে দাসত্বের বন্ধনশৃঙ্খল খসিয়া পড়িল, ব্রহ্ম, চীন ও মালয়ের চরণ হইতে। সে আন্দোলনের দোলা লাগিল ইন্দোচীন, ইন্দোনেসিয়া ও শ্যামের প্রাণকেন্দ্রে। অচিরে আফ্রিকা জাগিয়া উঠিল তাহার শতাব্দীর জড়নিদ্রা হইতে। দেশের পর দেশ উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিতে। সে উত্থানের আজও বিরাম নাই এবং বিরাম ঘটিবে না ততদিন পর্যন্ত—যতদিন না সমগ্র মহাদেশ আপনাকে স্বাধীন সংস্থাসুলভ আত্মমর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সে শুভদিন আর অধিক দূরবর্তী নয়।

কবি একদা ভারতকে লক্ষ্য করিয়াই আক্ষেপ ভরে বলিয়াছিলেন, জাগ্রত ভগবানের অভয়-শঙ্খ আজ দিকে দিকে বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের-জনগণপথ আজ তাঁহারই জয়-রথের চক্র-ধ্বণিতে মুখর, অথচ ভারত আজ কই। সে কি আজও সর্বজন পশ্চাতে আত্মগুপ্ত অবস্থায় অবস্থান করিবে! ভারতকে সম্বোধন করিয়াই কবি একদা আহ্বান জানাইয়াছিলেন, সকলের সঙ্গে মিশিয়া বিশ্বের কর্মভারের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ গ্রহণ করিতে। স্বাধীন ভারত সূতিকাগারে শুইয়াই সে আহ্বান শুনিয়াছিল এবং সে আহ্বানে সাড়া দিয়

আগাইয়া আসিয়াছিল বিশ্বের বিরাট দায়িত্বের নিজের প্রাপ্য অংশ গ্রহণ ও বহন করিবার জন্য। নব জাগ্রত ভারত যখন স্বাধীন জাতি হিসাবে বিশ্ব-সভার বিশাল অঙ্গনে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সে অঙ্গনে তখন দুইটি প্রতিযোগী শক্তি-শিবিরের দ্বন্দ্বযুদ্ধের মল্লক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয়ের সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া একক দূরে দাঁড়াইয়া থাকা যে সম্ভব—সে কথা সেদিন কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। অভয়মন্ত্রের জন্য সিদ্ধ কেবলমাত্র আত্মিক শক্তি সম্বল করিয়া সে মল্লভূমে আসিয়া দাঁড়াইল শক্তি নিরপেক্ষ স্বাধীন সংস্থারূপে।

ভারতের স্কন্ধে ইহা বিধি নিয়োজিত দায়িত্ব। নিষ্ক্রিয় ও নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করিবার নিমিত্ত এ গুরুদায়িত্ব সে গ্রহণ করে নাই। সেখানে যে কোন পক্ষের অনাচার বা অত্যাচার সে দেখিয়াছে, তাহারই বিরুদ্ধে সে তুলিয়াছে নৈতিক প্রতিবাদের তীব্র তিরস্কার। অর্থের প্রলোভন এবং অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা অসহায়ভাবে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে তাহার পদপ্রান্তে। ভারত যখন এবং যেখানে দেখিয়াছে পরাধীন জাতির মুক্তিকামনাকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জন্য ব্যগ্র হইতে। সেই মুহূর্তে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে মুমুক্ষু জাতির দাবির সমর্থনে। ভারত নিজে যে স্বাধীনতার তীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া ধন্য শুচিস্নাত হইয়াছে, মুক্তিকামী কোনও জাতির মস্তকে সে তীর্থ সলিল সিঞ্চন করিতে সে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করে নাই। মুক্তিপ্রাপ্ত জাতিসমূহের অধিক সংখ্যক তাই ভারতের প্রবর্তিত শক্তিশিবির নিরপেক্ষ নীতিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া ভারতের সহিত আত্মিক সম্পর্কে আপনাদিগকে যে পরিমাণে জড়িত করিতেছে, উভয় শক্তিশিবিরের মধ্যবর্তী ব্যবধান বিস্তৃতিলাভ করিতেছে ঠিক সেই অনুপাতে এবং সেই অনুপাতে দূরায়িত হইতেছে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বনাশা সম্ভাবনা।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের যে গুরুদায়িত্ব ভারতের জন্য নির্ধারিত ছিল, ভারত তাহা সাহসের সহিত গ্রহণ করিয়াছে এবং বহন করিয়া

চলিয়াছে সাফল্যের সঙ্গে। পনরই আগস্ট তাই কেবলমাত্র ভারতের মুক্তিদিবস নয়, বিশ্বের রাজনৈতিক দেয়াল পঞ্জীতে তাহা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া ভারতের ভবন চূড়ে চূড়ে সে বিজয়-নিশান আজ সগর্বে উড়াইয়া দাও। সঙ্কীর্ণ যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও প্রাদেশিক উন্মত্ততা আজ উদ্দাম হইয়া উঠিয়া ভারতের জাতীয় সংহতি বিনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে, জাতীয় ঐক্যের প্রতীকচিহ্ন স্বরূপ এই পতাকা আন্দোলিত হোক তাহাদের মোহান্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। প্রাদেশিক উন্মত্ততার যুবকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত হইয়া যাহারা আজ নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় হতচেতন সেই সব হতভাগ্য-দিগকে আত্মশক্তিতে পুনঃ সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে সক্ষম কেবলমাত্র এই জাতীয় পতাকা। স্বাধীন ভারতের এই শুভ জন্মদিনে সে পতাকা যদি জনসাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে অপসারিত হয়, তাহা হইলে জাতির সুদীর্ঘ ও সুকঠোর সাধনা ও অর্জিত সিদ্ধির গৌরবময় ইতিহাসের অবমাননা ও অবলুপ্তি ঘটিবে। পনরই আগস্ট দীর্ঘজীবী হোক, দীর্ঘজীবী হোক জাতীয় ঐক্য ও তাহার মূর্ত্ত প্রতীক জাতীয় পতাকা।

দৈনিক বসুমতী

শোক ও সঙ্কল্প

স্বাধীনতা লাভের পর এক যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুখ ও সমৃদ্ধির পথে ভারত দ্রুত পদক্ষেপে ছুটিয়াছে—বিশ্ববাসীকে শুনাইয়া এই ঢক্কানিনাদ অহরহঃ চলিয়াছে। রক্তের সাগরে সাঁতার দিয়া ভারতবাসী স্বাধীনতালাভ করিয়াছে আর সেই সাগরে সকলের চেয়ে বেশী রক্ত ঢালিয়াছে বাঙালী। আজ স্বাধীনতা লাভের পর এই বিশেষ দিনে সকল বাঙালীর অন্তরমথিত করিয়া উঠিয়াছে একটি-

মাত্র জিজ্ঞাসা—এ কি স্বাধীনতা! এতো আশীর্বাদ নয়, অভিশাপ। স্বাধীনতা সংগ্রামে যে বাঙালী বলি দিল তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রাণ, সেই সংগ্রামে সাফল্যলাভের পর স্বাধীন ভারতে বাঙালীর স্থান কোথাও নাই? স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রে বাঙালী কি শুধুই এক নূতন ইহুদী? বাঙালীর একমাত্র কাজ রক্তদান, আর অন্য সকলের কাজ সেই রক্তপান—একটি গোটা জাতির এই নিয়তি হইতে পারে না। ইহা বিধাতার অভিপ্রেত নয়।

স্বাধীন ভারত ঐক্যবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিবে, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক সুশাসিত দেশরূপে গৌরব অর্জন করিবে ইহা সকলেই চায়। সকল ভারতবাসীর ইহাই কামনার বস্তু; কিন্তু এই ঐক্য সাধনা তার জন্য স্বার্থত্যাগের দায়িত্ব কি একা বাঙালীরই, আর সকলের অধিকার শুধু ভোগের?

বাঙালী আত্মরক্ষায় দাবী করিলে তাহা হয় সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতাবাদ। আসামীরা জঘন্যতম প্রাদেশিকতা অবলম্বন করিলে তাহা হয় গৌরবপূর্ণ জাতীয়তাবাদ। আসামের ঘটনা দিল্লীর অধীশ্বরদের মুখোস টানিয়া ছিঁড়িয়া তাহাদের নগ্নমূর্ত্তি উজ্জ্বল দিবালোকে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ভারতরাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব যাঁহারা হাতে লইয়াছেন, চল্লিশ কোটি নরনারীর ধনপ্রাণসম্মান রক্ষার শপথ যাঁহারা লইয়াছেন —তাহারা পুরুষত্বহীন। নারীর সম্মান, শিশুর প্রাণ রক্ষাতেও তাহারা অক্ষম। রাজদণ্ড ইহাদের হাতে শিথিল। অত্যাচারীর শাস্তির জন্য ভারতের রাজদণ্ড উদ্যত হয় না, দুর্বিবত্তের শাসনের জন্য ন্যায়ের দণ্ড নামিয়া আসে না; নারীর সম্মান রক্ষায় দিল্লীর মসনদ কাঁপিয়া ওঠে না। আফ্রিদিরা একটি মিস্ এলিসকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, কাঁপিয়া উঠিয়াছিল সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, মিস্ এলিসকে উদ্ধার এবং হরণকারীদের কঠোর শাস্তির পর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট শান্ত হইয়াছিল। রামায়ণের কাহিনী ভুলিব না। ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধার বাহিরে ভারতবাসী, অন্তরে ফিরিঙ্গি, তাই ফিরিঙ্গির ইতিহাসই তাহাকে দেখাইব। এই কথাই বলিব— তোমার

অন্তরে যে ঐতিহ্য রহিয়াছে, তাহাও তো নারীর অসম্মানে লাঞ্ছিত বোধ করে, তুমি কি তবে ফিরিঙ্গিরও অধম? একটা গোটা জাতির কণ্ঠে আজ আর্তনাদ উঠিয়াছে—বাঙালী সমাজে নারী হইয়া জন্মালে অভিশাপ। এই আকুল আর্তনাদ যে শাসকের কর্ণে প্রবেশ করে না; একটি মুহূর্তের জন্যও দেশের শাসন দণ্ড হাতে ধরিয়া রাখিবার অধিকার তাহার নাই।

বাঙালীর আজ শোকের দিন, বেদনার দিন, পরম দুঃখের দিন। কিন্তু সেই শোকই যথার্থ শোক, যে শোকের পিছনে থাকে প্রতিকারের সঙ্কল্প। ভারতজননী অতীতেও শোকাকুলা হইয়াছেন, কিন্তু আবার পরক্ষণেই শোক সম্বরণ করিয়াছেন। এলায়িত কুন্তল বাঁধিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ ধার প্রসারিত করিয়া সন্তানদের অভয় দিয়াছেন, ডাকিয়া বলিয়াছেন—যুদ্ধে যাও, অত্যাচারীর শাস্তি দাও। জননীর আদেশ সন্তানের বাহুতে অযুত হস্তীর বল দিয়াছে, সন্তান ছুটিয়াছে অন্যায়ের প্রতিবিধানে। ইহাই ভারতের ঐতিহ্য, তাহা অপেক্ষাও বড় কথা ইহা বাঙালীর ঐতিহ্য, বাঙালীর প্রাণের ইহাই প্রকৃত মর্ম্মবাণী। বাংলার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস, জননীর বেদীমূলে আত্মবলিদানের ইতিহাস।

আবার আসিয়াছে সেই বাংলা মায়ের ডাক—হে আমার প্রিয় সন্তান, ওঠো, জাগো। স্বাধীনতার অমৃত ফল নির্বীর্য্য হাতে কেহ তুলিয়া দেয় না, উহা ছিনাইয়া আনিতে হয়। তুমি উহা আনিয়াছ, কিন্তু সে অমৃত ঘরে ঘরে পৌঁছিয়া দিতে পারো নাই। আজ সেই মন্ত্রে সেই নূতন ব্রতে তোমার দীক্ষা লাভের দিন। হে সন্তান অগ্রসর হও।

আজ সেই সঙ্কল্পের দিন। যে অমৃত ফল বাঙালী আনিয়াছে, সেই অমৃত বাঙালী একা ভোগ করিতে চাহে নাই। সকলকে সে তার ভাগ দিয়াছে। বাঙালী নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছে সে স্বার্থপর নয়, সে সঙ্কীর্ণচিত্ত নয়। যে উদারতা বাঙালী দেখাইয়াছে তাহার প্রতিদান সে পায় নাই, পাইয়াছে অবহেলা, ক্ষতি আর

অসমান। বাঙালীকে আজ বুঝিতে হইবে তাহারই ভবিষ্যৎ বংশীয়ের ন্যায্য প্রাপ্য তাহাকেই চাহিতে হইবে, অনিচ্ছুক হস্ত হইতে প্রয়োজন হইলে তাহা ছিনাইয়া আনিতে হইবে। অন্যায় আঘাতে অপ্রত্যাশিত অসম্মানে জর্জ্জরিত মানুষের বাঁচার দাবী কখনো সঙ্কীর্ণতার লক্ষণ নয়; উহাতে আত্মসমর্পণ করাই হীনতার পরিচয়।

বাঙালী জাগো! শোক সম্বরণ কর! প্রতিকারের পথ অনুসরণ কর! গগন বিদীর্ণ করিয়া তোল আত্মরক্ষার দাবী, দিল্লীর বাদশাহেরা যে ভাষা বুঝিতে পারে সেই ভাষায় কথা বল।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

যুগান্তর

স্বাধীনতা দিবসের সঙ্কল্প

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য এই স্বাধীনতা সশস্ত্র যুদ্ধ কিম্বা বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ শাসনশক্তির হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় নাই। এই স্বাধীনতা আসিয়াছে বৃটেনের সহিত আপোষ রফার দ্বারা, যার প্রধানতম সর্ত্ত ছিল ভারতবর্ষের পার্টিশান এবং স্বাধীন ও স্বতন্ত্র পাকিস্তানের সৃষ্টি। বৃটিশ পার্লামেণ্টের গৃহীত আইনের দ্বারা ভাতরবর্ষ ও পাকিস্তান একই সঙ্গে স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ঘোষিত হইয়াছিল। ১৫ই আগস্ট সেই স্বাধীনতার দিন, যখন পৌনে দুইশত বছরের বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিল। পরাধীনতার বন্ধনমুক্তি হিসাবে এই দিনটি নিশ্চয়ই স্মরণীয়, এমনকি পবিত্র।

এই পবিত্র দিনে আমরা প্রথমেই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিব তাঁদের, যাঁরা পরাধীনতা ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়া আত্মবিসর্জন দিয়াছেন। যাঁরা ঘরসংসার মায়ামমতার বন্ধন

ছিন্ন করিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বাধিকার অর্জনের জন্য অবহেলায় অজস্র লাঞ্ছনা বরণ করিয়াছেন, যে হাজার হাজার পরিবার দারিদ্র্য, নির্যাতন ও যন্ত্রণার মধ্য দিয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসকে ত্যাগ ও তপস্যার দ্বারা গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন, যে সমস্ত তরুণ কিশোর ফাঁসিকাষ্ঠে দ্বীপান্তরে জীবনের জয়গান রচনা করিয়া গিয়াছেন—সেই অজ্ঞাতনামা কিম্বা খ্যাতিমান স্বেচ্ছাসৈনিক ও দেশপ্রেমিকের উদ্দেশ্যে আজ সর্বাগ্রে প্রণতি জানাই। প্রণতি জানাই সেই সমস্ত গ্রাম্য সরল নরনারীকে, চাষীকে, কারিগরকে, মজুরকে, হিন্দু-মুশ্লিম, খৃস্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পারসীকে, পাহাড়িয়া ও উপজাতি নির্বিশেষে তামাম হিন্দুস্থানের সংগ্রামশীল জনতাকে। যাঁরা রক্ত দিয়া, অশ্রু দিয়া এবং বলিষ্ঠ বাহুর আঘাতের দ্বারা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা করিয়াছিলেন—গত একশত বছরের সেই ভারতীয় জনতার সংগ্রামকে অভিনন্দন জানাই। নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপনের জন্য রামমোহন রায় হইতে সুভাষচন্দ্র, লোকমান্য তিলক হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত যে সমস্ত মহান নেতা এই দেশে আবির্ভূত হইয়া লোকনায়কত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং চিন্তা, আদর্শ ও তপস্যার দ্বারা ভারতীয় জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত মহান সেনানায়কদিগকেও আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। আর স্মরণ করি মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে, যিনি এই ধ্যানগম্ভীর ভারতবর্ষকে বিশ্বজনীন মানবতার মন্ত্রে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্ময়কর আলোকে আন্তর্জাতিক মিলনসূত্রে উদ্বোধিত করিয়া গিয়াছেন। বাঙলার সাধনা ও দৃষ্টি প্রাদেশিক সীমানা, এমনকি ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমানাকে পর্যন্ত অতিক্রম করিয়া সারা পৃথিবীকে গ্রহণ করিয়াছিল। সেই উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসন্নতাকে আজ সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতে বরণ করি এবং মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করি ভারতবর্ষের সর্বত্র মানুষ এক এবং অবিচ্ছেদ্য—এক বিশ্বপরিবারের সঙ্গে ভারতরাষ্ট্র পরিবারের বন্ধন অচ্ছেদ্য।

স্বাধীনতা অর্জনের ১৩ বছর পর ১৯৬০ সালের আগস্ট মাসে এই মহান আদর্শকে নূতন করিয়া স্মরণের প্রয়োজন আছে। কারণ, ভারতবর্ষের একটি রাজ্যে ভারতীয় সংবিধানকে ভারতীয় রাষ্ট্রের ঐক্যবোধকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে আহত করা হইয়াছে। যে বাঙালী সারা ভারতের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করিয়াছে, সেই বাঙালীকে আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষেই নূতন করিয়া উচ্ছেদ করা হইতেছে। ইহা সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং আইন, ন্যায়নীতি, ও গণতন্ত্রের সর্বপ্রকার আচার আচারণ ও আদর্শ বিরোধী। বাঙালীর রক্তে ভারত স্বাধীন হইয়াছে—অখণ্ড বাঙলাকে এবং বাঙালীর পবিত্র বাসভূমিকে কৃত্রিম উপায়ে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল্লীর 'সিংহাসন' দখল করিয়াছে। বাঙালী স্বাধীনতার স্বাদ পায় নাই, পাইয়াছে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর চোখের জল, হাজার হাজার বেকার, দরিদ্র ও লাঞ্ছিত পরিবারের আত্মাবমাননা। তার সঙ্গে আবার প্রতিবেশী আসাম রাজ্য হইতে আসিয়াছে প্রচণ্ড রূঢ় আঘাত। এই অবিচার, এই অন্যায়, এই স্পর্ধিত বর্বরতার কোন প্রতিকার হইল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে ন্যায়দণ্ড উত্তোলন দূরের কথা, একটা কঠিন কঠোর নিন্দাত্মক প্রস্তাব পর্যন্ত গ্রহণ করিলেন না। সুতরাং ভারতরাষ্ট্রের এই স্বাধীনতা উৎসবে বাঙালী ম্লানমুখ—তার ঘরে আনন্দ নাই, তার কন্যা ও মাতা অভিশাপগ্রস্তা, তার সন্তানেরা হতভাগ্য। সুতরাং পশ্চিম বাংলায় কোন উৎসব নয়, দীপাবলী নয়, কোলাহল মুখর কোন আনন্দিত জনসভা নয়—নিঃশব্দ প্রতিবাদ, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোক-গম্ভীর মৌন প্রতিবাদ গণতন্ত্রের হত্যার বিরুদ্ধে। অবিচলিত ধৈর্য, অনাহত সংযম এবং অপরিমিত প্রশান্তির সঙ্গে এই স্বাধীনতা দিবস-কে আমরা উদযাপিত করিব এবং সঙ্কল্প গ্রহণ করিব ভারত রাষ্ট্রের গণতন্ত্রকে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিবার জন্য। আমাদের নালিশ অসমীয়াদের বিরুদ্ধে নহে, আমাদের নালিশ অসমীয়াদের গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে, যে গুণ্ডামী ভারতীয়

নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করিয়াছে। আর আমাদের প্রতিবাদ সেই কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যারা রাষ্ট্রের ন্যায়ধর্মকে অপমানিত করিয়াছে।

কিন্তু সংখ্যালঘুর প্রতি, বাঙালীর প্রতি এই অবমাননা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রকে আমরা বন্দনা করিব। রাষ্ট্রীয় পতাকার প্রতি আমরা আণুগত্য জানাইব। কেননা, আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক, আমরা ভারত রাষ্ট্রের প্রজা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের সাধনায় ও তপস্যায় এই ভারতবর্ষের বন্ধন মুক্তি ঘটিয়াছে। এই স্বাধীনতার আমরা গৌরবান্বিত অংশীদার। জনগণের ইচ্ছা হইতেই রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব, সেই জনগণ আমরা, যাদের হাতে রাষ্ট্রের আদর্শ অবলুন্ঠিত, যাদের অত্যাচারে ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্র কলুষিত, প্রয়োজন হলেই জনগণের অনিবার্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা তাদের অপসারণ ঘটাইব এবং সর্বভারতে সর্বমানুষের সাম্য, মৈত্রী ও মুক্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিব।

স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত বাঙালী ও ভারতেব সমস্ত দরিদ্র মানুষের এই সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্প চতুর্দিকে গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষিত হোক!

—জয়হিন্দ !!

লোক সেবক

শোক-দিবস

পনরই আগস্টের ইতিহাসে শোকমূলক তাৎপর্য নূতন কিছু নয়। তের বৎসরের প্রশাসনিক নেশায় যাঁহারা মশগুল, তাঁহারা গান্ধীজীর

কথা ভুলিয়াছেন, ভুলিয়াছেন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট গান্ধী-নির্দিষ্ট আত্ম-অনুজ্ঞার কথা, ভুলিয়াছেন জালিনওয়ালাবাগের পরবর্তী জাতীয় প্রতিবাদের স্বরূপ।

বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধকল্পে বাঙালীদের বঙ্গোপসাগরে সলিল-সমাধিদানের সাধু সঙ্কল্প কাহারও অবচেতন মনে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে হয়তো। সেই জন্য এটিলা-চেঙ্গিজের উত্তরসাধকেরা ভারতের পূর্বোত্তর-সীমান্তে রক্তমাখা দংষ্ট্রা মেলিয়া বর্বরতার অতন্দ্র অভিযানে রত। আর যাঁহারা আসমুদ্রহিমাচল যোজন-সহস্র চক্রবর্তীক্ষেত্রের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা, তাঁহারা জুগুপ্সার লীলাবিলাসে মত্ত। নিজেদের স্বার্থানুগামিতা তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি কলুস-ক্লিষ্ট করিতেছে।

কিন্তু বেদ-পুরাণের যুগে যাহারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, যাহাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্য এবং সাংস্কৃতিক গরিমা ভারতের অন্যতম অবলম্বন, যাঁহারা যুগে যুগে সমস্ত হামলা প্রতিহত করিয়াছে, অহোমগণের বর্বরতায় তাহাদের জীবনীশক্তি নিশ্চয়ই নিঃশেষিত হইবে না। তাহারা জানে, দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি। তাহারা দান্তের মত সুদৃঢ় আশাবাদের ওপর নির্ভরশীল হইয়া ভাবিতে পারে—

> Not on flowery beds
> Nor under the shade of canopy reposing
> Heaven is won.

তাহারা রবীন্দ্রোপলব্ধির অমৃত শক্তিতে বিপদের সহিত পাঞ্জা কষিতে অভ্যস্ত। আজিকার শোকদিবসে তাহারা বাঁচিবার সঞ্জীবনী মন্ত্রে নূতন দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

স্বাধীনতা

এবারের স্বাধীনতা দিবস

আজ ভারতের স্বাধীনতার ত্রয়োদশ দিবস।

এ বছর স্বাধীনতা দিবসের সূর্য্যোদয়ে উৎসবের নির্মল সমীরণ গণতান্ত্রিক মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানাইবে না, আহ্বান করিবে না উৎসবে মাতিয়া ওঠার।

আসামের সদ্য অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ্বের দুঃখময় স্মৃতি, অর্দ্ধ লক্ষাধিক ছিন্নমূল মানুষের অশ্রুসজল দৃষ্টি ও অসহায় দীর্ঘশ্বাস, শাস্তিপ্রাপ্ত সহস্র সহস্র কেন্দ্রীয় সরকারী উদ্বেগ ভাবনায় বাতাস ভারাক্রান্ত। এ সত্য কেহই এক মহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারেন না যে, দেশের এই নবজাগ্রত ঐতিহাসিক শক্তি কংগ্রেসী সরকার সৃষ্ট সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের পক্ষে পীড়নমূলক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের মূল্যের দ্রুত উর্দ্ধগামী দশার প্রতিকারের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। আর তাঁহারই জন্য তাঁহাদের প্রতি কংগ্রেসী শাসকবর্গ এই ধরণের জঘন্য প্রতিশোধ প্রকৃতি চরিতার্থ করিতে চাহিতেছেন। আজ দুঃখ ও বেদনা, ক্ষোভ ও ক্রোধভরা অন্তকরণে সবাই স্মরণ করিবেন যে, উৎসবে মাতিয়া ওঠার অবকাশ নাই।

কিন্তু নিরুপায়ের নিশ্চলতায় নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকারও দিন আজ নহে। আজ সর্বত্র প্রতিবাদের চিহ্ন আঁকিয়া দিতে হইবে, শান্তিপূর্ণভাবে ও সজোরে জানাইতে হইবে যে "নানা ভাষা, নানা বেশ নানা পরিধান" যুক্ত ভারতবাসীর মহান মিলনকে বিষাক্ত করিবার

চক্রান্তকারীদের কোন ক্ষমা নাই। আজ ভারতবাসীর প্রতিবাদ দিবস পালনের দিন।

প্রতিবাদ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নয়। অসংখ্য শহীদের আত্মদানের মধ্যদিয়া এ স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। প্রতিবাদ এই রাষ্ট্রশক্তির পরিচালনার অধিকারী একচেটিয়াপতিদের স্তাবক কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে।

কংগ্রেসী শাসকবৃন্দ রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনা নীতি সম্পর্কে সংবিধানের নির্দেশকে প্রতিপদে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের গণতান্ত্রিক অগ্রগতির প্রতিটি মোড়ে কায়েমী স্বার্থের স্বার্থে গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে কুটীল চক্রান্তের প্রতিবন্ধ রচনাকারী। তাঁহারা সকল প্রকার বিভেদ বিস্তারের দ্বারা নিরন্তর মহান ভারতভূমির আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তোলার অপচেষ্টা চালাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা আমাদের সংবিধানে রাষ্ট্রের কর্ম পরিচালনার জন্য নীতিগত নির্দেশাবলী পদদলিত হইলে আদালতে নালিশ করিবার অধিকার লিপিভুক্ত করিতে পারে নাই। আমাদের সংবিধান প্রণয়নকারী গণপরিষদে কংগ্রেসদল ছিলেন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

কিন্তু আমাদের স্বাধীন জীবনের পিছনে ফেলিয়া আসা দিনগুলির অসংখ্য শহীদেরা ১৯৪৯ সালের ভূমিসংস্কার আন্দোলনের শহীদেরা, কারাগারে নিহত বন্দী শহীদেরা, ১৯৫৫ সালের ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠণের জাতীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার আন্দোলনের ও গোয়ামুক্তির শহীদেরা, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের শহীদেরা, বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনে জানা অজানা আরও অন্যান্য শহীদেরা ভারতের গণতান্ত্রিক জনগণের বৃহত্তর আদালতের জন্য কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে যে অভিযোগপত্র নিজেদের বুকের রক্তে লিখিয়াছেন তাহার ন্যায়-বিচারের দায়িত্ব সমগ্র গণতান্ত্রিক জনগণের।

আমাদের শহীদদের নিকট ঋণ পরিশোধের জন্যই কেবল বিচার করিতে হইবে না। নিজেদের ভবিষ্যতের স্বার্থেও ভারতবাসীর

সচকিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ সাম্প্রতিককালে কংগ্রেসীশাসক-বৃন্দ নিজেরা যে দ্রুত দক্ষিণে হেলিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতি-ক্রিয়ার জন্য নূতন আরও যে সব সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিবার নীতি গ্রহণে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহারা বিপজ্জনক পরিণাম সম্বন্ধে কোন গণতান্ত্রিক মানুষই উদাসীন থাকিতে পারেন না। এবারের স্বাধীনতা দিবসের আগে সংঘটিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম্মচারীদের ধর্মঘট ও আসামের ভাতৃঘাতীদ্বন্দ্ব কোন মামুলী ঘটনা নহে। এগুলি দেশের জাতীয় জীবনের পক্ষে পরম গুরুত্বপূর্ণ দুইটি ঘটনা। জাতীয় জীবনের বিভিন্ন শক্তির গতি-প্রকৃতি এই দুই ঘটনার আলোকে সম্পূর্ণ উদ্‌ভাষিত হইয়া পড়িয়াছে। জাতীয় অগ্রগতির পক্ষে নূতন সম্ভাবনা, আবার, নূতন বিপদের সংকেত স্পষ্ট দৃশ্যমান হইয়াছে। গণতান্ত্রিক শক্তি এই ঘটনাগুলির যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করিতে নিশ্চয় বিরত থাকিবেন না।

আজ ত্রয়োদেশ স্বাধীনতা দিবস। আজ কংগ্রেসী শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে জাতীয় প্রতিবাদ অভিব্যক্ত করার দিবস। আজ গণতন্ত্র রক্ষা ও সম্মুখে অগ্রসর দুর্বার করিয়া তুলিবে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে ঐক্য দৃঢ়তর করিয়া তোলার শপথ গ্রহণের দিবস। এবং আজ সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রতি সজাগ নজর রাখুন।

বাণী …

ওগো বাংলার যুবক সম্প্রদায়, স্বদেশ সেবার পূণ্য যজ্ঞে আজ আমি তোমাদের আহ্বান করছি, তোমরা যে যেখানে যে অবস্থায় আছ ছুটে এসো।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরাচারের মিত্ররা চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করতে কখনও পারেনি, কখনও পারবে না।

রাজা রামমোহন রায়